বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 563. July, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৩ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৭। জুলাই, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ব্যবস্থার সংস্থাপন—আমাদিগের দেশের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ শবকে দাহ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার উপকারিতা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা প্রচলিত আছে কোথাও শবকে প্রোথিত করা হয় (গোর দেওয়া), কোথাও বা (পারস্যে) জন্তুগণের ভোজনার্থ শ্মশান-পর্ব্বতাদি স্থানে ইহাকে নিক্ষেপ করা হয়, কোথাও বা (মিশরে) শবকে, ঔষধ মাখাইয়া শুষ্ককরণানন্তর, কোনও স্থানে স্থাপন করা হয়, এবং কোথাও বা শবকে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, এই সকল প্রথার অনুপকারিতা ততই বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হইতেছে, এবং সেই প্রাচীন-আর্য্যগণ-নির্দ্দিষ্ট শবদাহন-প্রথার যে কত উপকারিতা তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। (সম্প্রতি চৈত্র মাসের সাহিত্যসংহিতায় শবদাহনের উপকারিতা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।) অধুনা সর্ব্বত্র এই প্রথার সংস্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ককের মৃতদেহ জর্ম্মণীর অন্তর্গত বেনে সহরে চিতানলে ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

নারীগণের অধিকার লাভের চেষ্টা—ইংলণ্ডের সুশিক্ষিতা মহিলারা পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১০০০০ দশ সহস্র রমণী দলবদ্ধ হইয়া লণ্ডন সহরের রাজপথে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী এস্কুইথ্ মহিলাগণকে রাজনৈতিক অধিকারদানে অনিচ্ছুক, কিন্তু মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্যের মতে, নারীদিগকে রাজ-

নৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা অনুচিত।

নবাবিষ্কৃত কৃষিপ্রণালী—ভারতের কৃষি বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে। যে বৎসর বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমেরিকার কৃষিবিজ্ঞান-বিদ্ ব্যক্তিগণ বিনা সলিলসেচনে শস্য-উৎপাদন-প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গবর্ণমেন্ট শুষ্কভূমিতে শস্য উৎপাদন করিয়াছেন, এবং ক্রমে যে তথায় কৃষির আরও অধিক উন্নতি হইবে, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষিকংগ্রেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোথাও বলিয়াছেন।

বিনা জলে শুষ্ক মরুভূমিতে কি প্রকারে শস্য জন্মান যায়, ইহা জানিতে পারিলে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে, যদি লাঙ্গল বা কোদালি দ্বারা ভূমি অতি গভীরভাবে কর্ষণ করা হয়, এবং মৃত্তিকা অতি সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার নিম্নস্থ রস উর্দ্ধে উঠিয়া উপরের মৃত্তিকাকে রসযুক্ত করে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বিনা জলেই তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সার দিবার প্রয়োজন হয় না। মিঃ ম্যাকনারেল নামক এক ব্যক্তি কলের লাঙ্গল দ্বারা মরুভূমি গভীররূপে কর্ষণ করিয়া গত বৎসর ১৫০০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার এক ফোঁটাও জলের প্রয়োজন হয় নাই। (সঞ্জীবনী হইতে গৃহীত।)

আমাদের দেশে এইরূপ কৃষি-প্রণালীর অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

দান—(১) স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পাতিয়ালার মহারাজ, ফিরোজপুরস্থিত শিখ-কন্যা-মহাবিদ্যালয় ফণ্ডে ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়ে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(২) বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগার-নির্ম্মাণার্থে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ দান অতীব প্রশংসনীয়।

বাণিজ্য-সচিব—বিলাতের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, মিষ্টার ক্লার্ক ভারতের বাণিজ্য-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিতেছি মিষ্টার ক্লার্ক একজন অভিজ্ঞ ও উদারনৈতিক।

মৃত্যু—জর্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা ডাক্তার গেল অষ্টনবই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির সম্মান।

প্রাণিহিতৈষী মঙ্গলময় বিধাতার মহদভিপ্রায় সাধনার্থেই স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় জাতি সৃষ্ট হইয়াছে পুরুষ সকল স্ত্রীগণকে অবজ্ঞা করুক, অবিশ্বাস করুক, অসম্মান করুক, ইহা যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহা আর্য্যগণ উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং তাহা বুঝিতে পারিয়াই স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তাহা শাস্ত্রে উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে স্ত্রীসম্মানপ্রভাবে প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মী বিরাজিতা ছিল। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থভবনই সুখের নিলয়, শান্তিদেবীর প্রিয় বাসস্থান ও পবিত্রতা-দেবীর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র-পূতা ও অসামান্যা বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতিতে শৌচ আছে, পবিত্রতা আছে, মধুরভাষিতা আছে এবং আরও অনেক গুণ আছে। এই সকল গুণ আছে বলিয়াই তাঁহারা সম্মানার্হা।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বশ্চ শুভাং গিরং।
পাবকঃ সর্ব্বপূতত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতোহ্যতঃ॥
গরুড়পুরাণম্॥

অনুবাদ। সোম (চন্দ্র) স্ত্রীলোক-দিগকে শৌচ, গন্ধর্ব্বগণ তাহাদিগকে শুভা বাণী (উত্তম বাক্য বা মধুরভাষিতা) এবং পাবক (অগ্নি) তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার পবিত্রতা দান করিয়াছেন। অতএব যোষিদ্‌গণ অবশ্যপূজ্য।

মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি চতুর্গুণ, এবং ব্যবসায় বা কর্ম্মোদ্যোগও ছয় গুণ। সুতরাং যাঁহাদের বুদ্ধি পুরুষ অপেক্ষা অধিক, যাঁহাদের ব্যবসায় পুরুষ অপেক্ষা অধিক, তাঁহারা কেনই বা পুরুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত না হইবেন?

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে উক্ত আছে—"সমস্ত জগতে দুর্গাদেবী স্ত্রীস্বরূপে অবস্থিতা আছেন" অর্থাৎ স্ত্রীজাতিই সে জগদম্বারই বিকাশবিশেষ মাত্র। "যে দেবী মাতৃরূপে জগতের স্ত্রীজাতিতে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া পুত্রস্নেহ করেন।" ইত্যাদি। অতএব স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও যা, উমাদেবীর প্রীত্যর্থে কার্য্য করাও একরূপ তাহাই। প্রাচীন সংহিতাকারগণও বলিয়াছেন,—যে গৃহে স্ত্রীলোক পূজিত হয়, তথায় দেবগণ প্রীত হইয়া বাস করেন, অর্থাৎ সেই ভবনের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সাধিত হয়। আবার যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা হয় না, সেখানে কোন প্রকারেই মঙ্গল নাই; এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানরক্ষার্থে যথেষ্ট অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন,—"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।

অবমন্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্॥

অনুবাদ। যিনি স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষা করেন, তাঁহার পদে পদে শুভ হয়। যে পুরুষাধম স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া যায়, সতী পার্ব্বতী দেবী পদে পদে তাঁহার অমঙ্গল করেন।

যেমন আমরা আমাদের বাড়ীতে পূজা করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপ বা দেবগৃহ রাখি, তেমনি দেবীতুল্যা সম্মানার্হা স্ত্রীজাতির পূজা বা সম্মান করিবার জন্য অন্তঃপুর নামক পবিত্র স্থান রাখিয়া থাকি। যেখানে মাতার নিকট অলৌকিক স্নেহ, পত্নীর নিকট অকৃত্রিম প্রেম, কন্যার নিকট প্রগাঢ় ভক্তি, এবং অন্যান্য আত্মীয় মহিলাদিগের নিকট যথাসম্ভব স্নেহ ভক্তি ও পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়; যেখানে পীড়ার সময় শুশ্রূষা ও ক্লান্তির সময় বিশ্রাম ও সকল অবস্থাতেই বিনোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই অন্তঃপুর নামক স্থান কেনই বা না পবিত্র হইবে? এরূপ পবিত্র স্থান পর্য্যবেক্ষণের ভার কি যাহার তাহার উপর দেওয়া যায়? তাই আমাদের প্রাচীন সংহিতাকার মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—বৃদ্ধ পিতাকে অন্তঃপুর রক্ষার ভার দিবে। পুরাকালে ভূপতিদিগের অন্তঃপুরের নাম শুদ্ধান্ত ছিল।

"শুদ্ধাঃ কামোপরতরক্ষকা অন্তেহন্ত"

যাহার প্রান্তভাগ সংযতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধচরিত্র কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহাকে শুদ্ধান্ত কহে। যেমন স্থাপিত বিগ্রহের বা দেবদেবীর পূজালয় পর্য্যবেক্ষণের ভার শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণবিশেষের প্রতি অর্পিত থাকিত, তেমনি নৃপতিদিগের অন্তঃপুররক্ষার ভারও শুদ্ধচরিত্র ও গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ছিল। স্ত্রীরূপিণী দেবীর সেবার জন্যই পিতা প্রভৃতি আত্মীয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। যেমন বিগ্রহ বা দেবদেবীর সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি পূজার্হা স্ত্রীজাতিরও সেবক কখন কখন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই পরিবর্ত্তন বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে;—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতিরেব তাম্।
বার্দ্ধকে রক্ষেত পুত্রোহনাথা জ্ঞাতয়স্তথা॥"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীলোকদিগকে বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র রক্ষা করিবেন। অনাথা স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞাতি বা আত্মীয়গণ রক্ষা করিবেন।

"তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যম্পশ্যা যা দারা শুদ্ধান্তশ্চ পতিব্রতাঃ।
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মস্থিতা স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্ত্রীজাতি সম্মানার্হা বা যত্নে রক্ষিতব্যা, এইজন্য তাহাদিগকে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়, পরম কৃতিগণ সেইরূপ করিবেন। যে সমস্ত দারা

অসূর্য্যম্পশ্যা, তাহারা শুদ্ধা ও পতিব্রতা (এইরূপ প্রায় দেখা গিয়া থাকে)। স্বামিসাধ্যা ও কুলধর্ম্মভয়ে স্থিতা কান্তা (মৃত্যুর পর) কান্তের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ নারীদিগের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া যে তাহাদিগকে অন্তঃপুর নামক কারাগারবিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ইহা কাহারও মনে না করাই ভাল। সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ চরিত্র দ্বারা নিজেই নিজকে রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের অন্তঃপুরে থাকা না থাকা সমান।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্ত রক্ষেয়ুস্তা সুরক্ষিতাঃ॥"
মনুসংহিতা।

অনুবাদ। আপ্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধা থাকিলেও দুঃশীলা স্ত্রীকে অরক্ষিতা বলিয়া জানিবে। যে সাধ্বী স্ত্রীচরিত্রপ্রভাবে আপনি আপনাকে রক্ষা করেন, তিনিই সুরক্ষিতা।

প্রাচীন কালে সম্মানপ্রদর্শনার্থ মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা হইত বটে, কিন্তু প্রয়োজনবিশেষে সাধারণসমক্ষে উপস্থিত হওয়া তাহাদের পক্ষে নিষেধ ছিল না। মহীপালগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে দীক্ষিত হইয়া মহিষীর সহিত প্রকাশ্য স্থানে উপবেশন করিতেন। পতিপ্রভৃতি আত্মীয় সহ যোষিদ্গণ তীর্থভ্রমণে গমন করিতেন। যে সমস্ত বিদ্যালয় বা চতুষ্পাঠী নারীদিগের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় গমন তাহাদের নিষেধ ছিল না। পুরবনিতাগণ তপোবনে মুনি ও মুনিপত্নীদিগের নিকটে ধর্ম্মোপদেশলাভার্থে গমন করিতেন। নরপতিদিগের অন্তঃপুরের সন্নিকটে এক একটী পুষ্পবাটিকা থাকিত, তথায় রাজমহিষী ও রাজকন্যাগণ দাসী ও সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ুসেবনার্থে গমন করিতেন। সভাগৃহে ও নৃত্যগীতাদি-উৎসব-দর্শনস্থানে মহিলাগণ গমন করিতেন, তাঁহাদের বসিবার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ধাত্রী, যোদ্ধ্রী, শিল্পব্যবসায়িনী ও উপদেশাকাঙ্ক্ষিণী রমণীগণ যখন যেখানে প্রয়োজন বোধ করিতেন, সেইখানেই যাইতেন। কোন কোন বিদুষী রমণী বিচার বা শাস্ত্রীয় তর্ক করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতসভায় গমন করিতেন। অবশ্য এ কথা এখানে বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের উপবেশনস্থানও তথায় পৃথক্ থাকিত। কোনও কোনও পতিবিরহিণী সাধ্বী পতির অন্বেষণার্থে আপ্তজন সহ দেশবিশেষে পর্য্যটন করিতেন। উপায়হীনাবস্থা হইলে বা প্রয়োজনবিশেষ উপস্থিত হইলে, স্ত্রীলোকগণ মৃত আত্মীয়ের শব বহন করিয়া লইয়া শ্মশানে যাইতেন এবং দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেন। বাহুল্যভয়ে উপরিবর্ণিত বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হইল না। শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অনেক ধর্ম্মকার্য্যে, অনেক লৌকিক কার্য্যে, অনেক উৎসবে, অনেক বিপৎপাতে ও অনেক

বিপদুদ্ধরণকার্য্যে, মহিলাগণ অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন। যদি অপরাধীদিগের কারাবরোধের ন্যায় নারীদিগকে অবরোধ নামক কোন স্থানে অবরুদ্ধ রাখাই প্রাচীন আর্য্যদিগের অভিপ্রেত হইত এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখা না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে যাইতে দেওয়া হইত না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির পূজারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পূজাঙ্গীয় কার্য্যের মধ্যে কুমারীপূজার বিধান আছে। অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণকন্যাকে কুমারী কহে। যেমন দেবদেবীকে আসন স্বাগতাদি ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়, তেমনি কুমারীদিগকেও ষোড়শোপচারে পূজা করা হইয়া থাকে। অন্নদাকল্প নামক তন্ত্র বিশেষে উক্ত আছে, সাধক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং রবিসংক্রমণকালে, বস্ত্রালঙ্কার ও ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপকরণ দ্বারা কুমারীকে পার্ব্বতীর সহিত অভেদ ভাবিয়া পূজা করিবে। ইহাতে দেবীর প্রসন্নতা এবং সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়।

সধবাকেও ভগবতীর অংশ বোধে, সম্মান করিবার নিয়ম আছে। কোন কোন ব্রতোপলক্ষে বা কৃত্যবিশেষে সধবাকে ভোজন করাইবার ও তাহাকে দান করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুগৃহে বিধবাগণ তপস্বিনীদিগের ন্যায় সম্মানভাজন। বিধবাগণ, বিলাসকর বোধে স্রক্‌চন্দনভূষণাদি, অপবিত্রকর বোধে কতিপয় খাদ্য দ্রব্য এবং সংযমবিরোধকর বোধে কতিপয় আচার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠার একশেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সদাচারবতী আর্য্যবিধবা নারীকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বর্গাবতীর্ণা দেবী, মূর্ত্তিপরিগ্রাহী ধর্ম্ম বা গৃহস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নস্থিত তৃতীয়াশ্রমের ন্যায় বোধ হয়। এই জন্য বিধবা গৃহস্থাশ্রমস্থা হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মচারিণী বা বানপ্রস্থাশ্রয়িণী তাপসীর ন্যায় সম্মান করিতে হয়।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে গর্ভিণী স্ত্রীলোক বিশেষ দয়ার পাত্রী। গর্ভিণীর যথোপযুক্ত পরিচর্য্যাসাধনের জন্য যে করণীয় আছে, তাহাকে গর্ভিণ্যবেক্ষণ বা কুমারভৃত্যা কহে। উপযুক্ত ধাত্রী ও সুচিকিৎসক গর্ভিণীর সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন। পুরাণ ও সংহিতাশাস্ত্রে লিখিত আছে, বাড়ীতে গর্ভিণী স্ত্রীলোক থাকিলে তাহাকে অগ্রে ভোজন না করাইয়া গৃহস্থ আহার করিবে না।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ, পোষণ ও অলৌকিক স্নেহ করেন বলিয়া জননী সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া। অভিধানের টীকাকার ভরত বলিয়াছেন, "মান্য তে পূজ্যতে যা সা মাতা"— অত্যন্ত মান্য বা পূজা করিতে হয় বলিয়া জননী "মাতা" বলিয়া অভিহিতা হন। পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে "পিতা

অপেক্ষাও মাতা পূজনীয়া। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বাগ্রে মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা ও পিতা যদি এক স্থানে থাকেন, তবে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পরে পিতাকে প্রণাম করিবে।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, "মাতাকে ভক্তি করিয়া প্রসন্না করিতে পারিলেই পার্ব্বতী দেবী সন্তুষ্টা হন"। মনুসংহিতাতে লিখিত আছে— "বৃদ্ধ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিবার জন্য যদি হীন কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তবে তাহাও করিবে।"

মার স্নেহ যেমন অনির্ব্বচনীয় তেমনি মা এই নামটীও কি জানি কি দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। শিশু বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই মা বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ে যে শান্তি প্রাপ্ত হয়, ভাষায় এমন কোন কথা নাই, যাহা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায়। "মা" এই শব্দ উচ্চারিত হইলে কখন ভক্তিভাব, কখনও বা স্নেহভাবের উদ্রেক হয়, বোধ হয় এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে পরভার্য্যাকে মাতৃসম্বোধনে অহ্বান ও মাতৃবৎ চিন্তনের অনুশাসন আছে ;—

মাতরিত্যেব শব্দেন যাঞ্চ সংভাষতে নরঃ।
সা মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মঃ সাক্ষী সতামপি
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ॥

অনুবাদ। মনুষ্য মা বলিয়া যাহাকে সম্ভাষণ করেন, তিনি সত্য সত্যই মাতৃতুল্যা অর্থাৎ তাঁহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। এ বিষয়ে ধর্ম্মই সাধুদিগের সাক্ষী।

কোন কোন স্ত্রীলোকে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদিগের শাস্ত্রে অনেক প্রকার মাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকালে যেমন মাতৃস্তন্য পান করা যায়, তেমনি ধাত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করা গেলে তাহাকেও মাতৃতুল্য সম্মান করিবে। মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, মাতুলানী, পূর্ব্বজপত্নী, পিতৃব্যস্ত্রী শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়া আত্মীয়া মহিলারা মাতার ন্যায় স্নেহ করেন বলিয়া ইহাঁরাও মাতৃতুল্য সম্মানার্হা।

(ক্রমশঃ।)

বিধবা।

তিন অক্ষরের "বিধবা" এই শব্দটী কি ভয়ানক! কি মর্ম্মভেদী যাতনাদায়ক! হিন্দুসমাজের গৃহে গৃহে এ শোকবহ্নির অভাব নাই। বিধবা রমণীদের এ সংসারে সান্ত্বনা নাই, আশা নাই, তাহাদের জীবন জলন্ত বাড়বানল। তাহারা বিষম তাপে দিবানিশি দগ্ধ হয়, ও কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয় স্বজনকে দগ্ধ করে।

বিধবা-জীবন কি প্রকার সন্তর্জ্জিত, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছনাময়, তাহা ভুক্তভোগী

ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী যে কি পদার্থ এবং কত সাধনার বস্তু, তাহা সকল স্ত্রীলোকে বুঝে না। স্বামী দেবতা, স্ত্রীর ইহপর-কালের সঙ্গী। প্রকৃত স্বামী স্ত্রীর শুভ-প্রার্থী হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন, জীবনে মরণে সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হন, এবং পত্নীকেও অগ্রসর করেন। প্রকৃত প্রণয় যেখানে, প্রকৃত পতিপত্নীত্ব যেখানে, সেখানে পতি-পত্নী পরস্পরে পরস্পরের ইহ পরকালের সঙ্গী। প্রকৃত প্রণয় একের অভাবে মলিন বা বিলুপ্ত হয় না। বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন পুনঃ পুনঃ পোড়াইলেও বিবর্ণ না হইয়া বরং আরও উজ্জ্বল হয়, প্রকৃত প্রণয়ও সেইরূপ বিরহ-আগুনে অধিকতর সমুজ্জ্বল হয়, এবং অতি পবিত্র মধুরভাবে প্রণয়ীকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রণয়ের মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদের আকর্ষণশক্তি অধিক। কিন্তু বাসনা-মলে মলিন প্রণয়ের সম্বন্ধ জীবনা-বধি। এই জন্যই আমরা স্বামীর দেহ-ত্যাগে স্বামীর অভাবে অত্যন্ত অভাব বোধ করিয়া যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়ি। আমাদের এ বিহ্বলতা কতক পরিমাণে স্বার্থবিজড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীর অভাবে হৃদয়ে দাগ বসিবে না বা উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। স্বামীর মৃত্যুতে যে স্ত্রীর হৃদয় অক্ষত থাকে, এবং যে স্ত্রী স্বামী ও প্রণয়কে উপেক্ষায় ভাসাইয়া দিতে সমর্থা, তিনি "পত্নী" এই মহৎ আখ্যার অনুপযুক্তা। বস্তুতঃ কখন কোন রমণীর পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই ও হইবে না।

স্বামীর অভাব হইলে কেহ কেহ শোকা-তুরা বিধবাকে উপদেশ দেন যে "এ সংসারে সব মিথ্যা, পত্নী পতি আদি সম্বন্ধ জীবনাবধি, এ সব বৃথা মায়া এবং মোহ মাত্র, অতএব অতীতের স্মৃতি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেল। বিধবা রমণী সাবধান! ঐ সুধাস্মৃতি কখনও ভুলিও না। ঐ স্মৃতি তোমাকে জগৎপতির প্রেমাস্বাদ বুঝা-ইবে। স্বামীর প্রেম ভগবৎপ্রেমের অপূর্ণাংশ, উহাই কালে পূর্ণ হইয়া ভগবৎ-প্রেমে পরিণত হইবে। বিচ্ছেদ আগুনের তাপ প্রাণে যত অধিক পশিবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ তত পরিষ্কার হইবে।

স্বামী স্ত্রীলোকের জীবনে মরণে সুহৃদ, স্বামী যোগ কর্ম্ম ভক্তি, স্বামীই স্বর্গ-মোক্ষ-অর্থ, স্বামীই গুরু জ্ঞানগম্য, স্বামীই ইষ্ট, ও উপাস্য দেবতা। এবং স্বামিপ্রেমই স্ত্রীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা অনে-কেই সময়ে এই উপাস্য দেবতা চিনিতে পারি না। বিধাতার কি এক কৌশলময় নিয়ম! অনায়াসলভ্য জিনিষের মূল্য প্রায় বুঝা যায় না। বিশেষতঃ অভাবে না পড়িলে কোনও বস্তুরই প্রকৃত মূল্য হৃদ্‌বোধ হয় না। বিধবাজীবনেই স্বামী ও প্রণয়ের মহত্ত্ব অধিকতর পরি-স্ফুট হইয়া সঙ্কটময় বৈধব্য জীবনকে রক্ষা

করে। মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, ইহা হাসির কথা বটে। অন্যে হাসে হাসুক, কিন্তু বিধবা ভগিনি! তুমি হাসিও না। উহা সত্য কথা। উহা শুনা কথা বা কোন গ্রন্থের কথা নহে, কল্পনার ভাবও নহে। সাধারণতঃ যে সব বিধবা ভগিনীকে পতিত হইতে দেখা যায়, আমার বিশ্বাস, তাহাদের পতনের মূল কারণ তাহাদের মৃত স্বামীর প্রতি ভক্তির অভাব এবং তাহাদের প্রণয়বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বিধবা-জীবন কি প্রকার সঙ্কটময় ও বিড়ম্বিত, তাহা বিধবামাত্রই অবগত আছেন। রমণীহৃদয় সাধারণতই অতি কোমল এবং পরাশ্রিত। কোমল লতা যেমন অন্য আশ্রয় ব্যতীত মাথা তুলিতে পারে না, পরাশ্রিতা নারিজাতিও পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ পরাশ্রিতা নারীজাতির একাকী বৈধব্যজীবন কি প্রকার সঙ্কটময় তাহা বর্ণনার অতীত। বিধবা রমণীকে পাপ-প্রলোভনময় বিপদসঙ্কুল এই জগতে একাকী জীবন ধারণ করিতে হইবে। তাহাকে দুটী ভাল কথা বলিয়া সুপথ দেখাইয়া দিতে এ জগতে কেহ নাই। তাহাকে একাকী জীবনের লক্ষ্য ঠিক্ রাখিয়া গন্তব্য পথ চিনিয়া লইয়া সর্ব্বদা বিপদ্-বাধাপূর্ণ পথে চলিতে হইবে। একে বিষম আঘাতে হৃদয় চূর্ণ! প্রাণে অনন্ত নৈরাশ্যের অতৃপ্ত পিপাসা! সংসার দাবানলময়! নিজের জীবন যেন তীব্র হলাহল! এ অবস্থায় আপনাকে ঠিক রাখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপথ নির্ব্বাচন করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া কি প্রকার কষ্টসাধ্য, এই অবস্থায় কত ধৈর্য্য ও কত শক্তির প্রয়োজন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিধবাজীবনের এই অবস্থায় শক্তি ও ধৈর্য্য নিজের নয়। স্বর্গীয় স্বামিদেবতার পবিত্র প্রণয়ের সুধাময় ফলস্বরূপ; রূপান্তরে শুভময় জগৎপতির করুণা-কটাক্ষ বই আর কিছুই নহে। নতুবা রমণীজীবনে এমন কোন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে ঐ দুর্য্যোগের সময়ে ঠিক থাকিয়া সে নিজ লক্ষ্যপথে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম, স্বামীর অভাব হইলেও পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় কখন বিলুপ্ত হয় না। যে দম্পতীতে প্রকৃত পবিত্র প্রণয় ছিল, শুধু সে রমণীই বৈধব্য-জীবনের সঙ্কটময় অবস্থায় স্বামি-স্মৃতি-ধ্বজা ধরিয়া, অতীত প্রেমের সমুজ্জ্বল প্রদীপ হস্তে করিয়া, পবিত্র প্রণয়জাত শক্তি-ধৈর্য্য হৃদয়ে লইয়া, নানা প্রকার প্রলোভনপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল অন্ধকারময় পথে নৈরাশ্যের বজ্রাঘাতে মুহ্যমান হৃদয় লইয়া লক্ষ্যোদ্দেশে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। অতীত স্মৃতি বিধবা রমণীর অতি আদরের সামগ্রী এবং আত্মরক্ষার পক্ষে অক্ষয় কবচ। স্বামী-শব্দটি বড়ই মহৎ। স্বামী স্ত্রীজীবনের যা কিছু সকলি। শুধু স্বামী হইতেই রমণীজাতি পরকে আপন

করিতে শিক্ষা করে। নব-বিবাহিতা বধূ গৃহে আসিলে, তাহার সমুদায় অপরিচিত। শ্বশুর শ্বাশুড়ী হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত কাহাকে ত সে চিনে না। এমন কি, স্বামী পর্য্যন্ত অপরিচিত। তথাপি "স্বামী" এই শব্দটার কি মোহিনী শক্তি! সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারের মধ্যে অপরিচিত স্বামীর সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং অপরিচিত আত্মীয়গণ স্বামীর, শুধু এই সূত্রে নব-বিবাহিতা বালিকার প্রাণ অত্যধিক পরিমাণে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়-বন্ধন যত গাঢ় হয়, স্বামীর প্রিয়জনের সহিত ততই সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা অধিক হয়। এইরূপে দেখা যায়, দম্পতীর প্রণয়বন্ধন যে পরিমাণে পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও গাঢ় হয়, স্বামীর স্বজনগণের প্রতি রমণী-গণের ব্যবহারেও সেই পরিমাণে তারতম্য হইয়া থাকে। বিধবাজীবনেও তাহা স্বাভাবিক, বরং বিধবাজীবনে ইহা আরও স্পষ্টরূপে বিকাশ পায়।

অভাগিনী বিধবা রমণী সাক্ষাৎ ভাবে স্বামি-দেবতার সেবায় ত বঞ্চিতা; এই হেতু স্বামীর প্রিয় জিনিষ তাহার বড়ই আদরের। এক দিকে যেমন স্বামীর প্রিয় জিনিষ বিধবাজীবনের আদরের, অপর দিকে স্বামীর প্রিয় কার্য্যও তদ্রূপ। স্বামী রমণীর পূজার দেবতা, কিন্তু এ পূজা পুষ্পপত্রে হয় না। মহাজনগণ বলেন, ভগবানের প্রিয় কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। স্বামি-দেবতার সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার পূজা।

মৃত স্বামীর মাতা পিতা প্রভৃতি গুরু-জনের এবং তাঁহার স্নেহাস্পদ ভাই-ভগিনী ও সন্তান প্রভৃতির প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার ও তাহাদের সেবা যত্ন, এবং তিনি যে কার্য্য ভাল বাসিতেন, তাহাতে সচেষ্ট থাকা, যে ভাবে জীবন গঠিলে তিনি সুখী হইতেন, সেই ভাবে আপনাকে গঠন করা প্রভৃতিই তাঁহার সেবা বা পূজা। অবশ্য সদসৎ বুঝিয়া। কিন্তু এই কার্য্যেই আবদ্ধ হইয়া, মায়ায় ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতা হইলে চলিবে না। তাঁহার প্রিয়জনের সেবা ও তাহার প্রীতির কার্য্যে আনন্দের সহিত সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বদা মনে এই ভাব জাগাইতে হইবে যে, এ সব কিছুই আমার নয়। এ সবই তাঁহার, আমিও তাঁহার। তাঁহার আমি তাঁহারই কার্য্য করিতেছি। মোটের উপরে যথোপযুক্ত-রূপে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কর্ত্তব্য বলিয়া করিতে গেলে বিধবাজীবনে তাহা বড়ই শুষ্ক ও স্বাদহীন বোধ হইয়া বিরক্তিজনক হইবে। সবই স্বামীরই, এ ভাবে সকল কার্য্য ও ব্যক্তির প্রতি প্রাণের অপূর্ব্ব প্রীতির ভাব আসিবে এবং এ সেবাতেই হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভূত হইবে। এই সেবাই ক্রমে ভগবৎ-সেবার সোপানস্বরূপ হইবে। সাবধান! আপনাকে মোহে ডুবাইয়া দিয়া জীবনের উদ্দেশ্য কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ষোড়শোপচারে নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার

পূজা করিয়া থাকে। সেই বাহ্যিক পূজাই ভগবৎপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ। এই স্থানেও এইরূপ সেবাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান, ইহা কেহ বিস্মৃত হইবেন না। লোকে ধাতু প্রস্তর বা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত বিগ্রহের পূজা করিয়া চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া সিদ্ধ হয়। আমরা চৈতন্যময় বিগ্রহের সেবা করিয়া ও চৈতন্যময় প্রণয়ীর প্রণয় ধ্যান করিয়া কি বিফলমনোরথ হইব? (ক্রমশঃ)

পূজ্যপাদ ভক্তিভাজন

উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণোপলক্ষে।

সংসারে কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত ভক্ত আছেন। জ্ঞানবান্, কর্ম্মী বা কর্ম্মানুরাগী ভক্ত দুর্লভ নহে, কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্মানুরাগী ভক্ত সংসারে বড় বিরল। জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ও কর্ম্মের ব্যস্ততা যখন ভক্তের ব্যাকুলতা ও প্রেমপ্রবণতার সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন মানবজীবন প্রকৃত প্রয়াগে পরিণত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এ তিনটী মুক্তিসাধনার প্রধান অবলম্বন। যখন ইহারা ত্রিবেণীধারার ন্যায় কোন জাগতিক আধারে সম্মিলিত হয়, তখন মানবজীবনের সেই পুণ্য তীর্থে সেই প্রীতি ও পবিত্রতার সাগরসঙ্গমে প্রেমের বান ডাকিয়া আসে। তখন তীরস্থিত কণ্টক, কঙ্কর ভাসিয়া যায় এবং পুণ্যধৌত বেলাভূমি প্রেমের দান বুক পাতিয়া গ্রহণ করে। যখন কোনও সৌভাগ্যবান্ মানব জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনের সামঞ্জস্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন, তখন মানবত্ব ও দেবত্বের বড় বেশী পার্থক্য লক্ষিত হয় না। মানব যখন ভক্তিগদগদচিত্তে জ্ঞানের নয়নে নিজ নিজ কর্ম্মফল দেখিতে পায়, তখন তাহার হৃদয়ে যে আত্মানন্দের মধুর ভাব আসিয়া পড়ে, সেই ভাবে সে, জগৎকে আপন হৃদয়ে টানিয়া লয়; জগৎও সেই হৃদয়স্বর্গে অবস্থিত হইয়া আপনা ভুলিয়া সেই মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া দেখে কি? দেখে, দেবকল্প সাধু পুরুষ আত্মপর ভুলিয়া জগতের কাজে নিযুক্ত। দেখে, প্রেমিক প্রেমাকুলচিত্তে আশে পাশে প্রেম বিলাইতেছেন। দেখে, জ্ঞানী নিজ জ্ঞানের মহিমায় মুগ্ধপ্রাণ হইয়া নিজ হৃদয়ের তত্ত্বকথা গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতেছেন। ধন্য জগৎ! ধন্য! ধন্য সে দেশের মাটি! যে দেশে এমন লোক জন্মে। এমন পবিত্রচেতা সাধুপুরুষ যে দেশের মাটি মাড়াইয়াছেন, সে দেশ তো পবিত্র হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের নৈতিক দুরবস্থা যখন চিন্তাশীল মানবহৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার করে, তখন ঐ যুগপ্রবর্ত্তনকারী মানবের পূত চরিত্র হৃদয়ে আশা ও সুখ

আনিয়া দেয়। এতদিন তাই আমরা ঐরূপ আশায় আশান্বিত ছিলাম, ছিলাম কেন, এখন ত আছি। যদিও সে আদর্শচরিত্র মহাপুরুষকে আজ আমরা হারাইয়াছি, তথাপি তাঁহার চরিত্রকথা, তাঁহার সাধনা, তাঁহার সিদ্ধি পাপী মানব-সন্তানের নিকট পরিত্রাণের কি শুভবার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে! আজ কি বিশ্বাস, কি জ্ঞানবিশ্বাস, কি কর্ম্মবিশ্বাস, কি ভক্তিবিশ্বাস মানব-প্রাণে জাগিতেছে। উঠ মানব, উঠ! আজ যে ঐ ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র দেবচরণে আত্মবিক্রয় করিলেন, তদ্বিনিময়ে তিনি কি পাইলেন। তিনি পাইলেন, শান্তি, তৃপ্তি, আশা ও সুখ! যদি তুমি,—শান্তি পাইতে চাও, যদি তুমি পরিতৃপ্ত হইতে চাও, যদি তুমি আশান্বিতহৃদয়ে সুখের সাগরে ভাসিতে চাও, তবে এস, এই একাধারে জ্ঞানী কর্ম্মী ও ভক্তের জীবনচরিত্র সমালোচনা কর। নিরাশপ্রাণ! ভগ্নহৃদয়! তুমি এস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তোমারি জন্য। সাংসারী বৈষয়িক তুমিও, এস সুব্যবস্থা ও কর্ম্মানুরাগ তোমারি জন্য। জ্ঞানী ভক্ত তোমরাও এস, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেম তোমাদেরি জন্য।

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন (Child is the father of man.) এ উক্তির সত্যতা মৃত মহাপুরুষের জীবনে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল। বালককাল হইতে তাঁহার জ্ঞানের তৃষা অতি প্রবল ছিল। জগতে যাঁহারা বড় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী পরজীবনের মহত্ত্বের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া থাকে। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় মানবের যে বিশেষত্ব তাহাকে অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, বাল্যে তাহার উন্মেষ দেখিতে পাই। ধর্ম্মানুরাগ বালক উমেশচন্দ্রের জীবনে কে জানে কোন্ স্বপ্নস্বর্গের সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। বুঝিবা সেই সময়ে তিনি সে উন্মুক্ত দ্বারপথে দেবতরু পারিজাতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন। বুঝি বা উপাসনাশীল দেবকন্যাদিগের মধুর স্তুতিগীতি সেই দ্বারপথ দিয়া তাঁহার কর্ণে স্বর্গসুখের প্রিয়বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। বুঝি বা, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তখনই তাঁহার নয়ন-সম্মুখে মহত্ত্বের কি অপূর্ব্ব রাজ্য বিস্তার করিয়া দিয়াছিল। তাই আমরা এই জ্ঞানযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই কর্ম্মযোগীকে পাইলাম। তাই আমরা এই ভক্তিযোগীকে পাইলাম। তিনি দরিদ্রতা, অভাব ও অসুবিধার সঙ্গে যুঝিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় সংসারে প্রবেশ করিলেন। মানুষ বুঝিল, Where there is a will there is a way—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অদৃষ্টবাদীর কুটতর্কজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিল। জগতের জড়তা, অভাব, অশান্তি, বিরোধ আধ্যাত্মিক উন্নতিস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। দুঃখ দারিদ্র্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

নিকট অধীন ভৃত্যের ন্যায় নতশির হয়।

জীবনে কি অনন্ত কর্ম্মজগৎ তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল! মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত একটী দিনের জন্যও সে পুণ্যজগৎ তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকে নাই। কর্ম্মজগতের হিতার্থে কর্ম্ম তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। কর্ম্মময় সে জীবনের পুণ্যগাথা উপকথার ন্যায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হউক। বাঙ্গালী শিখুক, কাজে কত সুখ! মানুষ বুঝুক, কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। তিনি তাঁহার জীবন আপনার মনে করেন নাই। সে জীবন দেবকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্ম-কর্ম্মই মানুষের ধর্ম্ম। তিনি তাই বুঝিয়াছিলেন। তাই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া অত পরিশ্রমের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে শ্রমকাতর দেখে নাই। কর্ম্মের জন্য এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কয়টা পাওয়া যায়? কি অধ্যয়নে, কি অধ্যাপনায়, কি সভায় কি সমাজে, কেহ তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও কর্ম্মবিরত দেখে নাই। বৃক্ষতলবাসী যোগী যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় সংসারচিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার হৃদয়দেবের অনুধ্যানে প্রাণমন সমাহিত করেন, আমাদের এই কর্ম্মযোগীও তেমনি বিশ্রাম ও বিলাসের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে দৃঢ় মনঃসংযোগ করিতেন; কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না, কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। রাজর্ষি জনক কর্ম্মযোগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ভক্তহৃদয়ের পরীক্ষিত সত্য কলির মানুষের কাছে লুক্কায়িত থাকে নাই। তেমনি উজ্জ্বল ভাবে, তেমনি প্রকটভাবে তাহা প্রকাশ রহিয়াছে ও থাকিবে। ধন্য সেই মানুষ! যে আপন জীবন ঐ মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে চালনা করিতে পারে। দেবতা তাহারি মস্তকে সম্মান ও যশের মুকুট পরাইয়া দেন। হায়! সে যশোগর্ব্বে গর্ব্বিত, সে সম্মান-ভূষণে ভূষিত মূর্ত্তি আমাদের বাহ্যনয়ন-পথ হইতে অপসৃত হইল! দেখিতে দেখিতে পূর্ণিমা রজনীর মধুময়ী জ্যোৎস্নার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। আজ যে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ-চন্দ্র পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল, সে চন্দ্র কি আর উঠিবে? সমুদ্রসম মানবহৃদয় যে চন্দ্রদর্শনে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, মানব-হৃদয় কূলে কূলে যদ্দর্শনজনিত ভক্তির জোয়ারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে চন্দ্রের কি দেখা আর পাইব? আবার কি প্রাচী-দিক্‌মূলে বিজলীরেখার ন্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ ভাসিয়া উঠিবে? হায়, কে জানে, উঠিবে কি না! উঠুক আর না উঠুক, কিন্তু সে স্নিগ্ধ চন্দ্রকরতলে সমাজকাননে যে সংস্কারতরু মঞ্জুরিত হইয়াছে এবং যে তরুর ফুলে ফলে জ্ঞানের সৌগন্ধ ও ধর্ম্মের স্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তো বাঁচিয়া থাকিবে? সে শুভ্র জ্যোৎস্নায় ভাবের উদ্যানে যে ভক্তি-প্রীতি-বিনয়ের কুসুম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সৌগন্ধ তো চিরকাল মানবকে শান্তির ত্রিদিব-দ্বার খুলিয়া দিবে? তাহা

হইলেই তো সমগ্র মানবসমাজ ধন্য হইবে।

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত-হৃদয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু কালে যখন উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়, তখন নির্ম্মল হৃদয়া স্রোতস্বতী যেমন নীরবে বহিয়া যায়, শোকভারগ্রস্ত মানবমন তেমনি নীরবে, তেমনি শান্তিতে বহিয়া যায়। মানুষ যদি দেবতার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারিত, মানুষের সুখ ও দেবতার সুখ যদি একই কারণোদ্ভূত হইত, তাহা হইলে মানবের জাতীয় ইতিহাসে আজ একটী পুণ্য দিন বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু মানুষের সে অদৃষ্ট, সে সুখ বিধাতা লেখেন নাই। মৃত্যুতে মানুষ আনন্দ করিতে শেখে নাই। তাইতো আজ আমরা শোকে এত অধীর। কেন শোক করি, কিসের শোক? আজ প্রবাসী সন্তান বহুদিন পরে পিতার কাছে ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ কয়েদী কারাপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিতেছে বলিয়া কি শোক করি? আজ ভক্ত মুক্তিলাভে সমর্থ হইল বলিয়া কি শোক করি? তা যদি করি, তাহলে আমাদের মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? আজি যে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর যশোমাল্য গলায় পরিয়া সগৌরবে স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত, তাঁর জন্য আমরা হাসিব না কাঁদিব? যিনি তাঁহার জীবিতকালে সৎকার্য্যকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও সরল করিয়া লইয়াছিলেন এবং যিনি মৃত্যুকালে মনুষ্যস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, শারীরিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করিয়া মনকে স্বর্গরাজ্যের পথপ্রবেশে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যিনি যশ চান নাই, মান চান নাই, সুখ চান নাই, শান্তি চেয়েছিলেন; যিনি বিশ্রাম চান নাই, কার্য্য চেয়েছিলেন; যিনি সমাজ চান নাই, সংসার চান নাই, কর্ত্তব্য চেয়েছিলেন; যিনি অর্থ চান নাই, প্রভুত্ব চান নাই, ধর্ম্ম চেয়েছিলেন; তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? যাঁর কর্ম্মে বিরাগ ছিল না, কর্ম্মফলে দৃষ্টি ছিল না, যাঁর আনন্দে স্বার্থ ছিল না, তাঁর জন্য হাসিব না কাঁদিব? আমরা হাসিব ও কাঁদিব, দুইই করিব। মানুষের উন্নতি দেখিয়া, মানুষ যে দেবতার সমকক্ষ হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমরা হাসিব। আর আমরা পৃথিবীর জীব, স্বার্থপর পৃথিবীর জীব বলিয়া কাঁদিব। যখন অন্ধকার ভেদ করিয়া তরুণ তপন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তখন তাহা মানবপ্রাণে আনন্দেরই সঞ্চার করিয়া থাকে। সে কিরণস্পর্শে অলসতা ও জড়তা দূরে পলাইয়া যায়। মানুষ তখন সানন্দচিত্তে নিজ নিজ কর্ম্ম বাছিয়া লয়। আজ যে কুসংস্কারের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া জগতের পূর্ব্ব ভাগে এক নব জ্ঞানের উদয় হইল, তাহা দেখিয়া কি মানবপ্রাণ আনন্দে নাচিয়া

উঠিবে না? এই জ্ঞান মৃত মহাপুরুষের সমস্ত জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও কর্ম্মের ফল। এই জ্ঞানসূর্য্য মৃত্যুর উদয়াচল হইতে আজ বাঙ্গলার পথে—বাঙ্গলার মাঠে তাহার কিরণমালা ছড়াইয়া দিতেছে। এ কিরণে তীব্রতা নাই, কেননা ইহা ভক্তি ও প্রেমের আবরণে আবৃত ভক্তি ও প্রেম এ সূর্য্যরশ্মিকে ছাঁকিয়া লইয়া পূর্ণিমার কৌমুদীতে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সমগ্র মানব-প্রাণ আশান্বিতহৃদয়ে জগতের কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। আশা ও আনন্দ তাহাদেরি জন্য, যাহাদের নয়ন-সম্মুখে অধ্যবসায় ও সফলতা জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। আজ কর্ম্মী দেখিতেছেন যে, কর্ম্মফল তাঁহা হইতে বেশী দূরে নয়। জ্ঞানী বুঝিতেছেন যে, জ্ঞানের আলোক আর তাঁহার কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে না। ভক্ত মনে করিতেছেন, ভগবান্ তাঁহার অতি সন্নিকটে। কে এ আশা আনিয়া দিল? মানবপ্রাণে কে আনন্দের ধারা ঢালিয়া দিল? ঐ জীবন, ঐ পুণ্যময়, প্রেমময়, কর্ম্মময় জীবন, আর ঐ অমৃতময় শান্তিময় মৃত্যু। এমন জীবন, এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তাই আমরা এ মৃত্যুতে আনন্দ করিতে পারি; আর পারি কাঁদিতে। জীবনের আদর্শ, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের দেবতা সেই আমাদের ধর্ম্ম-গুরুকে হারাইয়া কাঁদিব না তো কি করিব? মানুষ কাঁদে কেন? আত্মীয়বিরহে মানুষ কাঁদে কেন? তাহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া। সে প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি না দেখিলে, তাহার নয়নের তৃপ্তি হবে না বলিয়া, এ বিষম পরীক্ষাসঙ্কুল সংসারে সে জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ শুনিতে পাইবে না বলিয়া; সংসারে সুখ ও ভালবাসা আর সে উপলব্ধি করিতে পাইবে না বলিয়া। এ সবই তো স্বার্থ। তাই মানুষ কাঁদে। আজ সমস্ত বঙ্গের হৃদয় ভেদ করিয়া যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি কোথায় জানি না। তবে এটা জানি, এ পবিত্র ক্রন্দনে, এ ভগ্নহৃদয়ের অশ্রুজলে যে মাটি ভিজিয়া উঠিবে, তাহাতে শান্তি ও সুখের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। এই কান্নার শেষে মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আশার পূর্ব্বারুণপ্রভা জাগিয়া উঠে। মৃত্যু তখন আমাদের ধর্ম্মগুরুর শূন্য স্থান পূরণ করিয়া বসে। মৃত্যু বলে, "দেখ মানব! কি অনন্ত জ্ঞানরাশি আজ তোমার চক্ষের সম্মুখে ঢালিয়া দিলাম। তুমি বাছিয়া লও। তোমার জীবনোপযোগী জ্ঞান বাছিয়া লও। বাছিয়া লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। সুখ ও শান্তি তোমারি জন্য।" মৃত্যু ডাকে "এস ভক্ত! এস সাধু! এস প্রেমিক! যদি মরিয়া অমর হইতে চাও, আমার কাছে এস; যদি শান্তি চাও, আমার কাছে এস; গৌরব চাও, তবে এস আমি তোমার মাথায় যশের মুকুট পরাইয়া দিই।" কে থাকিতে পারে? এ ডাক শুনিয়া কোন্ ভক্তহৃদয় আকুল হইয়া না উঠে? এই ডাক শুনিয়া আজ আমাদের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানগুরু, কর্ম্মগুরু ঐ

মৃত্যুর অমৃতময় দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আর কি স্থির থাকিতে পারেন? সিদ্ধিকে সম্মুখে দেখিয়া সাধনা কি স্থির থাকিতে পারে? যাও তবে দেব! যাও ঐ অমৃতধামে ঐ যে দেববালাগণ শুভশঙ্খরোলে স্বর্গের আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। স্বর্গের প্রশস্ত পথ ঐ যে দেখিতে দেখিতে কুসুমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। আজ অমরধামে কি মহামহোৎসব! আজ মৃত্যুঞ্জয়ী কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর গৌরবরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। তাই বুঝি ঐ দেবদুন্দুভি বাজিতেছে! তাই বুঝি এত তূর্য্যনিনাদের ঘটা! যাও তবে ঐ অমৃতধামে। যেখানে চির-আশা, চির-আনন্দ, সেখানে যাও। যেখানে শান্তিতে সুখ, সুখে শান্তি, সেখানে যাও। যেখানে মিলনে বিচ্ছেদ নাই, বিচ্ছেদে দুঃখ নাই, সেখানে যাও। যেখানে ভালবাসায় স্বার্থ নাই, স্বার্থে পাপ নাই, সেখানে যাও। যেখানে চিরপূর্ণিমা, চিরবসন্ত, সেখানে যাও। যেখানকার আকাশ ভক্তি ও প্রীতির সৌগন্ধে আমোদিত, সেখানে যাও। যেখানে ব্রহ্মপ্রেমের মধুময় উৎস উৎসারিত, সেখানে যাও। সেই উৎসতলে বসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সেই বারি পান কর, সেই জলে অবগাহন কর, শোক, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণা সব ধুয়ে যাবে। ধুয়ে যাবে সংসারের আবিলতা, সংসারের ধুলা কাদা। তখন শান্ত সমাহিতচিত্তে, ভক্তিপ্রেমাপ্লুত হৃদয়ে কল্পতরুতলে বস, দেখিবে মুক্তি সম্মুখে।

হে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা! আজ যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইলে, তাঁহাকে তো তুমি তোমার ঐ আনন্দময় অমৃতময় ধামে চিরবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দনকাননের কল্পতরুমূলে তাঁহার সাধনবেদী তো নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছ। কিন্তু আজ আমাদের যে একটা শূন্যতা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা আর কে পূরণ করিয়া দিবে? হৃদয়ে অনন্ত শক্তি, বাহুতে অসীম বল লইয়া যিনি মনুষ্যের উদ্ধারব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তো টানিয়া নিলে। দয়াময়! আজ আমাদের এই নিরাশ প্রাণে, আজ আমাদের এই শোককাতর হৃদয়ে তুমি আশার আলোক জ্বালিয়া দাও। দুর্ব্বল প্রাণে বলসঞ্চার কর। আজ যে ভক্ত মহাজন অনন্ত সংসারসমুদ্রের তীরে তাঁহার পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, দেব! আমরা যেন সেই চিহ্ন ধরিয়া গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারি। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় সংসারবৃক্ষে যে অমৃত ফল ফলিয়াছে, আমরা যেন তাহা আস্বাদন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার মধুময় বাক্য এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। হৃদয়ে বল দাও দেব! যেন আমরা সে উপদেশ, সে বাক্য শুনিয়া চলিতে পারি। করুণাময় পরমেশ! আজ যাঁহাকে তুমি লইয়া গেলে, তাঁহার হৃদয়ে চিরশান্তি, চির

আনন্দ আনিয়া দাও। আজ যে দেব-হৃদয় দেবহৃদয়ে মিশিয়া গেল, সে মিলনে যেন বিচ্ছেদ না ঘটে। হে দেবদেব-পরমদেব! সে দেবপ্রাণকে তুমি আনন্দামৃতে পূর্ণ রাখ, ইহাই আমাদের প্রার্থনা, তুমি তাহা পূর্ণ কর। (১)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

স্ত্রীলোক ছাত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে কোন বালিকা গৃহে মানসিক চর্চ্চা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, স্কুলের পাঠের পর হইতে আবার বই ধরা তার পক্ষে জ্ঞানলাভের অতি উৎকৃষ্ট উপায়। রোজ সকালে ও বৈকালে তিন ঘণ্টা মনোযোগের সহিত পাঠ্য পুস্তক পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। আমার মতে দুই তিন বোন, কিম্বা ননদ, ভাজ এক সঙ্গে পড়িলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। উহাতে পরস্পরের সঙ্গে আড়া-আড়িতে মনে অধিক উৎসাহ জন্মে, আর সকলের গুণের সমতুলনা বশতঃ কেহ আত্মম্ভরী হইতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে নিজের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান্ বা চতুর দেখিলে আমরা আত্মশ্লাঘা করিতে বিরত হই, উহা দ্বারা আমাদের দুইটী মহামঙ্গল সাধিত হয়। একটী—উহা আমাদিগকে অহঙ্কার ভুলিতে ও পরিশ্রম করিতে শিখায়, অপরটী—লোহা যেমন লোহাকে তীক্ষ্ণ করে, তেমনি মানুষের সঙ্গ মানুষকে চালাক করে।

হিন্দু পরিবারের মহিলাদের পক্ষে নিয়মিতরূপে লেখাপড়া বা নিজের উন্নতি সাধন করা অসাধ্য, এরূপ ভাবিয়া যদি কোন পাঠিকা আত্মোন্নতিচর্চ্চায় অবহেলা করেন, আমি তাঁর সেই ভ্রমসংস্কারটা দূর করিবার জন্য নীচে আমাদের বাল্যকালের একটা প্রকৃত ঘটনা লিখিতেছি। আশা করি, উহা পড়িয়া অনেকেরই সাহস বাড়িবে। বিবাহের পর আমরা পাঁচ ছয় জন যা ও ননদ একত্র হইয়া লেখাপড়া করিতাম। সেই আড়া-আড়িতে আমাদের শিক্ষার যে কত দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। আরো, আমরা নিজ নিজ মানসিক কর্ষণের আশয়ে সকলে মিলিয়া একটা সভা করিয়াছিলাম। আমাদের সেই ক্ষুদ্র সমিতিটীর নাম দশ বার জন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর কেহ শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু বাল্য-কালের সেই সামান্য সভার প্রসাদেই আমি বোধ হয় এখন পাঠিকাদের সঙ্গে

(১) ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই জীবনী তাঁহার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের সময় আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু সে সময় স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে লেখকের বিশেষ অনুরোধে ইহা প্রকাশিত হইল।

আলাপ করিতে পারিতেছি। পরস্পরের মানসিক উন্নতিই আমাদের সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি রবিবারে বিকালে সভা বসিত, আমাদের মধ্যেই এক এক জন সভ্য পালাক্রমে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতাটী সচরাচর প্রবন্ধের ন্যায় লেখা হইত, কখন কখন কেহ বা দুই চারিটা কথা মুখে মুখেও বলিতেন। বক্তৃতার পরে তর্ক উঠিত, তর্কের পর দুই ঘণ্টা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা হইত; মাঝে মাঝে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে সঙ্গীতও গাওয়া হইত। আমাদিগের জীবনের প্রারম্ভে এইরূপ সুযোগ পাইতে দেখিয়া পাঠিকারা হয়ত মনে করিবেন, আমরা নিশ্চয়ই বড় ভাগ্যবতী ছিলাম। কিন্তু তাহা নহে। আমাদের ভাগ্য আপনাদের অপেক্ষা বেশী জলজ্বলে ছিল না। তবে আমরা নিয়তিকে জয় করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম, এবং উহাতে অনেকটা সফলও হইয়াছিলাম।

আমরা একটা হিন্দু পরিবারের অবরুদ্ধা বৌ-মেয়ে ছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিবাহের পর আমরা লেখাপড়া ছাড়িয়া দিই নাই, বরং স্বামী ও ভ্রাতাদের উৎসাহে অধিক মনোযোগের সহিত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হই। ক্রমে আমাদের সেই শিক্ষাপ্রিয়তা আমাদিগকে অধিক উচ্চ জ্ঞানের পথে আহ্বান করে। আমরা জ্ঞানের সেই প্রবল তৃষ্ণায় চঞ্চল হইয়া যেরূপ সাধ্য স্ব স্ব জীবনকে অধিকতর প্রশস্ত করিতে কৃতসংকল্প হই। আমাদের সভা সেই প্রতিজ্ঞার ফল। অন্তঃপুরের একটী নির্জ্জন ঘর আমাদের সভাগৃহ হইয়াছিল। আর তখন আমরা সকলেই ১৫।১৬বৎসরের বালিকা হইলেও দুই তিন জনকে জননীর কর্ত্তব্যে বিব্রত থাকিতে হইত। তাহা ব্যতীত অনেক দাস দাসী সত্বেও আমরা নিজেই অনেক গৃহকর্ম্ম দেখা শুনা করিতাম। কিন্তু, ইচ্ছা যেখানে, উপায় সেইখানে। এ সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়াও আমরা এক বৎসর কাল নিয়মিতরূপে সভার কাজ চালাই। সকাল সকাল সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া, ছেলেদিগকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়া, বেলা ৪টার সময় আমরা সভায় বসিতাম। সামাজিক, সাংসারিক বা নৈতিক বিষয় লইয়াই বক্তৃতা ও আন্দোলন হইত। আর উহা দ্বারা আমরা পরস্পরের দোষ-সংশোধনেরও চেষ্টা পাইতাম। তিন ঘণ্টা আলাপাদির পর ৭টার সময় সভা-ভঙ্গ হইত।

এক দিন আমরা ঐরূপ গুপ্ত সভায় ব্যাপৃত আছি, একজন সভ্য বেশ বক্তৃতা করিতেছেন, মাঝে মাঝে হাততালি ও ভেরী-শুভের ঘটা চলিতেছে, এমন সময় সভাগৃহে আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। তিনি প্রতি রবিবারে আমাদের এমন চুপচাপে একত্র সমাবেশ দেখিয়া বোধ হয় বড় কৌতূহলী হইয়াছিলেন, আর সে দিন ঘটনাক্রমে আমরা ঘরের দরজায় হুড়্কা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত

হইলাম, বক্তা তাঁর কাগজ পত্র লুকাইলেন, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তিনি আমাদের আচরণে বিরক্তির পরিবর্ত্তে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাদের সভার একজন সভ্য হইতে চাহিলেন। আমরাও সানন্দে তাঁহাকে সভাপতি করিলাম। আমাদের শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর ন্যায় ওরূপ অমায়িক মা বা শ্বাশুড়ী পাওয়া সকলের ভাগ্যে না ঘটিতে পারে, কিন্তু নিয়মিতরূপে সংসারের কাজ সারিয়া প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় দিলে কোন শ্বাশুড়ীই অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না। বিশেষতঃ, মেয়ে-বৌদের শিক্ষিতা দেখিতে আজ কাল সকল মা ও শ্বাশুড়ীদিগকে উৎসুক দেখা যায়।

আমরা যে কোন জ্ঞান লাভ করি, তাহা জীবনে কখন না কখন প্রয়োজনে লাগেই। সুতরাং যে দিক্ দিয়ে ও যেরূপেই হউক, জ্ঞানসঞ্চয় করা মানুষের প্রধান কাজ। জ্ঞানবুদ্ধিতেই মানুষ পশুর অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানবুদ্ধির কর্ষণের দ্বারা আমরা যতই আত্মোন্নতি করিতে পারি, ততই আমরা ইতর জীব হইতে দূরে আসি। সভ্যতাই বল, আর ক্ষমতাই বল, সে সবই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। সে জন্য আমাদের জীবনে যত দিন ঐ জ্ঞানের অভাব থাকিবে, ততদিন আমরা নিরুপায় ও হীনবল থাকিব। কিন্তু শুধু অনেক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান পাওয়া যায় না, ভাল বই পড়িয়া তার সারটুকু হৃদয়ঙ্গম করাই প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপায়। তাই আবার বলি, আমাদের এই সংকীর্ণ জীবনে উত্তম সারগ্রন্থ পড়িয়া মনকে প্রশস্ত করাই আমাদের উন্নতির একমাত্র ভরসা। এ কর্ত্তব্যে কোন বঙ্গনারী যেন অবহেলা না করেন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

জ্ঞানোপার্জ্জনের আশায় পুস্তক পড়িলে, কোন বই যে রকমে হোক পড়িয়া তাড়াতাড়িতে শেষ করিলে চলিবে না। পুস্তকের প্রতি পদ, প্রতি পৃষ্ঠা, অতি ধীরে ধীরে পড়িয়া তার ঠিক্ অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। প্রথম বারে যদি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে দ্বিতীয় বার পড়িবে; সে বারেও যদি উহার ভাব বুঝিতে না পার, তবে আবার পড়িবে। এইরূপে যত দিন না সমস্ত বইখানি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, ততদিন উহা ছাড়িয়া নূতন পুস্তক ধরিবে না। মানুষ লাফিয়ে কখনও একবারে তেতালায় উঠিতে পারে না, এক এক পা করিয়া সিঁড়ি উঠিতে হয়, এবং সিঁড়িতে উঠিবার কালে সতর্ক হইয়া না উঠিলে পা সরিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়টি যেন কেহ বিস্মৃত না হন। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সরল জীবনচরিত পড়িলেও মহা উপকার পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কার্য্যক্ষম ও সদাশয় লোকদের জীবনী দেখিয়া আমাদের মন অধিকতর দৃঢ় ও উৎসাহী হয়। আর আমরাও তাঁদের মত ধীরভাবে পরিশ্রম করিতে শিখি। পাঠকালে কথার মানে জানিবার বা কঠিন বিষয় সকল বুঝিবার জন্য যদি

কাছে অভিধান না থাকে, তাহা হইলে সকল কথা ও পদগুলি একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিবে; পরে সময়মত স্বামী, ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট বুঝাইয়া লইবে। আজ কাল হিন্দু-পরিবারের মধ্যে এরূপ যুবক বা বালক অতি অল্পই দেখা যায়, যাহারা স্ত্রী ও ভগিনীদের লেখা পড়ায় যত্ন দেখিলে আনন্দিত না হয়, বা উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য না করে। যে বালিকা বা স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বা কোন আত্মীয়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাঁর এরূপ না করিলেও চলে, কিন্তু যাঁরা সদয় ভাই বা স্বামীর যত্নে বঞ্চিত ও শিক্ষয়িত্রী রাখিতে অপারগ, তাঁহাদের জন্যই আমি এই শিক্ষাব্যবস্থাটী লিখিলাম। আর আজকাল অনেক পুরুষপরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগকে সুশিক্ষিতা দেখিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহাদিগকে নিজেরা শিক্ষা দিতে অক্ষম। এরূপ স্থলে নারীরা যদি আপন যত্নেই তাঁহাদের যোগ্য ভগিনী ও পত্নী হইতে পারেন, তাহা হইলে,তাঁহারা কতই সুখী হইবেন। আর বঙ্গবালার জীবনে কি মধুময় নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিবে।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২)

জননীর মৃত্যুর পর হইতে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল দেখা যাইত না। অধিকাংশ সময়ই তিনি বিমর্ষ থাকিতেন। কিন্তু এত দুঃখের সময়ও তিনি আপনার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হন নাই। মনে প্রফুল্লতা না থাকিলেও সাংসারিক কার্য্যে কিম্বা পুস্তক অধ্যয়নে কেহ তাঁহাকে অমনোযোগী দেখে নাই। তাঁহার পিতা টমাস পত্নীবিয়োগের পর হইতে বিষাদে কালযাপন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর হইতে কন্যা থারা সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বালিকা ছিলেন; সুতরাং গৃহকর্ম্মে তাঁহার] বিশেষ দক্ষতা ছিল না। কিয়দ্দিবসের মধ্যে লিন্‌কন্-পরিবারে বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইল। সংসারে সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য টমাস লিন্‌কন্ পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেণ্টকির অন্তর্ভূত এলিজাবেথ টাউনে জন্‌সন্ নামক কোনও এক ব্যক্তির বিধবা বাস করিতেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর টমাস এলিজাবেথ টাউনে ভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি উক্ত জন্‌সনের বিধবার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিধবাটীর একটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা ছিল। বিবাহের পর নবপরিণীতা ভার্য্যা ও তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন এবং তাঁহার সেই একমাত্র কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। আব্রাহাম্ নূতন জননী প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের শোকাগ্নি কতক পরিমাণে প্রশমিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আবার ধীরে ধীরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইণ্ডিয়ানায় আগমনের সময় টমাসের নবপরিণীতা সহধর্ম্মিণী নানাবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী ও অনেক গৃহসজ্জা আনয়ন করিয়াছিলেন। এইখানে কালে ডেনিস্ হাঙ্কস্ ও এলেন হল নামক দুইটী যুবকের সহিত জন্সনের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতে বিমাতারা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়া থাকেন, কিন্তু আব্রাহামের বিমাতা বাস্তবিকই দেবীস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থাগুণে লিন্‌কন্-পরিবারে আবার সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। আব্রাহামকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; লিন্‌কন্-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আব্রাহাম একজন সামান্য বালক নহেন। বালকের অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে তিনি বিস্মিতা হইয়াছিলেন। পুত্রের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া জননী সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। আব্রাহামের জননীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আব্রাহাম ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যমধ্যে কোনও উচ্চ পদ লাভ করিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করিবেন। টমাস ও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী আব্রাহামকে অসীম স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুত্রের প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে পারেন নাই। টমাস লিন্‌কনের গৃহে তিনখানি মাত্র পুস্তক ছিল। আব্রাহামের নূতন জননী "The Pilgrim's Progress ও Æsop's Fables" নামক দুই খানি পুস্তক পুত্রকে দিয়াছিলেন। আব্রাহাম লিন্‌কন্ এই নূতন গ্রন্থ দুইখানি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের পুস্তকপাঠের ইচ্ছা সর্ব্বদাই বলবতী থাকে, তাঁহাদের যে পুস্তকপ্রাপ্তিতে বিশেষ আনন্দ হয়, এ কথা বলা বাহুল্য। আব্রাহামের বিমাতা শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি পুত্রকে নিজ সামর্থ্যানুসারে পুস্তক পাঠ করাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ নীতিশিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শৈশবেই তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননীর নিকট হইতে ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁহাকে উত্তরকালে সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে সক্ষম করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় ইণ্ডিয়ানায় কোনও বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু আব্রাহাম লিন্‌কনের জননীর যত্নে তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি আব্রাহামকে

বিদ্যাশিক্ষার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। জননী পুত্রের বিদ্যালয়গমনের উপযোগী একটী পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর আব্রাহামের উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। জননীর সাহায্যে তিনি গৃহে পাঠ সমাধা করিতেন। পিতা একখানি গণিত পুস্তক ক্রয় করিয়া দিলেন। আব্রাহাম লিন্‌কন্ আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই বিদ্যালয়ে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডর্সি (Dorsey) তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। নানা কারণে শীঘ্রই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইল। আব্রাহাম গৃহে জননীর নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার জননীও সাতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

১৮২৩ খৃঃ অঃ স্পেন্‌সার প্রদেশবাসী এণ্ড্রু ক্রফোর্ড (Andrew Crawford) নামক এক ব্যক্তি শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া পুরাতন বিদ্যালয়গৃহে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। ক্রফোর্ড একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন। নূতন শিক্ষকের সমাগমের সঙ্গে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ পুনর্ব্বার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গুণে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং সম্মান করিত। ছাত্রদিগের মধ্যে কোনও রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি সুন্দররূপে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এক দিন বিদ্যালয়ে ছুটীর পর বাড়ী যাইবার সময় দুইটী বালকের মধ্যে এক বানান লইয়া মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বানানটী দুই জনেরই ভুল হইয়াছিল। প্রথমতঃ গালাগালি হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে দুইজনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হইল। এই বিবাদের পরিণাম অশুভ দেখিয়া আব্রাহাম লিন্‌কন্ উভয়কে মিষ্টবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনিই বিদ্যায় সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথায় দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল। ছাত্র দুইটী আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিশেষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও বিবাদ করিবে না বলিয়া আব্রাহামের নিকট অঙ্গীকার করিল। প্রতিভাশালী ছাত্র পাইলে তাহাকেই সমধিক যত্নে ও পরিশ্রমে শিক্ষাদান করিতে স্বভাবতই শিক্ষকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মিষ্টার ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে ছাত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পুস্তকপাঠের সঙ্গে ছাত্রগণ যাহাতে সদাচারী ও চরিত্রবান্ হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে প্রায়ই ভদ্রজনোচিত আচার ব্যবহার ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিতেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশগুলি যত্নের সহিত শ্রবণ করিতেন। আব্রাহাম্ কেবল

উত্তমরূপ পাঠ বলিতে পারিতেন বলিয়াই যে শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার সত্যবাদিতা দর্শনে শিক্ষক মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকেরা কোনও অপরাধ করিলে তাহা গুরুজনের নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। আব্রাহাম্ লিন্‌কনের কিন্তু সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে তিনি তাহা গোপন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে গুরুজনের নিকট স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। একদিন আব্রাহাম্ অসাবধানতাবশতঃ বিদ্যালয়ের দেওয়ালস্থিত একটী মহিষের শিং ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শিক্ষক এনফোর্ড বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, সত্যবাদী আব্রাহাম্ নির্ভয়চিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহার দর্শনে শিক্ষকমহাশয় বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং অসাবধানতা-জনিত তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের কিয়ৎ দিবস পর হইতেই আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার "প্রাণীদিগের প্রতি দয়া" শীর্ষক প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। বাল্য-কাল হইতেই তিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে দয়া করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ যদি কখনও কোন জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে সেই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে যত্নবান্ হইতেন। একদিন তাঁহার কতিপয় বন্ধু একটী কূর্ম্মকে দ্রুত গমনের জন্য নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া কৌতুক করিতে-ছিলেন। আব্রাহাম্ ইহা দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুগণকে সেই নিষ্ঠুর আমোদ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শেষে আব্রাহাম্ বাধ্য হইয়া বলপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুবর্গের হস্তে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের দুর্ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হন নাই। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ সর্ব্ব জীবে সমভাবে দয়া প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ভগ-বান্‌ও তাঁহার এই সৎশিক্ষার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"জীবে প্রেম স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে।
সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে॥"

আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জীবনের এই ঘটনাটী উক্ত পংক্তি দুইটীর সার্থকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কেবল বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি অন্যান্য পুস্তকও সংগ্রহ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত অধ্য-য়ন করিতেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের নাম সভ্য জাতিমাত্রেরই নিকট পরিচিত।

আব্রাহাম্ লিন্কন্ এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব হেতু পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। ওয়াসিংটন কি উপায়ে যুক্তরাজ্যের সভাপতির আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন, কি প্রণালীতে আপন মহত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য লিন্কনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী যোশিয়া ক্রফোর্ডের নিকট জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পুস্তক আছে। তিনি ক্রফোর্ডের নিকট গমন করিয়া কয়েক দিবসের জন্য পুস্তকখানি প্রার্থনা করিলেন। ক্রফোর্ডের নিকট তিনি এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুস্তকখানি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত হইবে, তাহার কোনও অংশ নষ্ট হইবে না। যোশিয়া ক্রফোর্ড আব্রাহাম্ লিন্কনের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিতে দিলেন। আব্রাহাম্ আগ্রহের সহিত বীরবর জর্জ্জ ওয়াশিংটনের জীবনচরিত আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যতই ওয়াশিংটনের জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে নৈতিক বলের এবং সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল এবং উত্তর কালে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের সমকক্ষ হইবার বাসনা জন্মিল। পুস্তকের কোনও অংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার জননীই তাহা তাঁহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। একদিন আব্রাহাম্ লিন্কন্ পাঠাবসানে রাত্রে পুস্তকখানি এক স্থানে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পর দিবস প্রাতে নিদ্রাবসানে দেখিলেন যে, পুস্তকখানি কোনও প্রকারে সলিলসিক্ত হইয়া একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ভাবনাস্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহার পিতার এরূপ সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য মিষ্টার ক্রফোর্ডকে একখানি নূতন পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ক্রফোর্ডকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন, লিন্কন্ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তকদাতার নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় দোষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে, তিনি শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যোশিয়া ক্রফোর্ড একটু বিরক্তির সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আব্রাহাম্ লিন্কন্‌কে নিজ শস্যক্ষেত্রে মজুরের ন্যায় কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। আব্রাহাম্ হৃষ্টচিত্তে ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত

হইলেন এবং পাঁচ দিবসের কার্য্য তিন দিবসেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া ইণ্ডিয়ানার অধিবাসিগন তাঁহার প্রতি একান্ত প্রীত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। এই কার্য্যকালে একদিন ক্রুফোর্ডের সহধর্ম্মিণী আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে তুমি কোন্ পদ পাইবার আশা কর।" প্রত্যুত্তরে আব্রাহাম্ ক্ষণ বিলম্ব না করিয়াই বলিয়াছিলেন, "যুক্তরাজ্যের সভাপতির (President) পদ।" ক্রুফোর্ডের পত্নী বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। বাল্যকাল হইতে আব্রাহাম্ হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সে আশা সফলও হইয়াছিল।

"Pitch thy behaviour low, thy projects high,
So shall thou humble and magnanimous be.
Sink not in spirit, who aimeth at the sky
Shoots higher much than he who means a tree."

আব্রাহাম্ লিন্কনের জীবনচরিত পাঠ করিলে জর্জ্জ হার্ব্বার্ট (George Herbert) লিখিত উল্লিখিত পংক্তি কয়টীর প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আব্রাহামের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সদ্গ্রন্থ পাঠের ন্যায়, সুবক্তৃতা শ্রবণেও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল। যেখানে খ্যাতনামা বক্তাগন বক্তৃতা করিতেন, আব্রাহাম্ সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার পর তিনি বক্তাগণের বক্তৃতার সারাংশ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে শত শত উচ্চ আশার সহিত, সুবক্তা হইবার আশাও অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এবং এই জন্যই উত্তরকালে তিনি যুক্তরাজ্য-মধ্যে একজন সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ।

অথ বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা নিদান।

বিসূচী রোগকে Cholera বা ওলাউঠা, অলসককে Tympanytis বা তলপেট-ফাঁপা, আর বিলম্বিকাকে Constipation বা কোষ্ঠবদ্ধ কহে।

যে রোগে অজীর্ণ হেতু বায়ু সূচী-বিদ্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিসূচী কহে। বিসূচিকা রোগে উদরে শূল হইয়া অতিশয় মলরেচন ও বমন হইতে থাকে। রোগীর দাহ, পিপাসা, বক্ষঃস্থলে এবং মস্তকে বেদনা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প ও জৃম্ভণ হয় এবং শরীর বিবর্ণ হইয়া হস্তপদাদিতে খাল ধরে। (নিদান)। অজীর্ণ প্রযুক্ত সূচী কর্ত্তৃক গাত্র বিদ্ধ হওনের ন্যায় বায়ু জন্য যাতনা হইলে বিসূচিকা বলা যায় (সুশ্রুত)। অলসক রোগে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাত-কর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া আধ্মান উৎপন্ন হয় এবং বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী তৃষ্ণা ও উদ্গার জন্য পীড়িত হয় এবং অতিশয় কষ্ট হেতু আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। (নিদান)

মূর্চ্ছা, অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভণ, দাহ, বিবর্ণতা কম্প, হৃদয়ে বেদনা, শিরোবেদনা, কুক্ষিদেশের আনদ্ধ ভাব (টেনে থাকা), আচ্ছন্ন প্রায় কূজন (গোঁ গোঁ শব্দ), বায়ু রুদ্ধ হইয়া কুক্ষিদেশে ধাবিত হওন এবং বায়ু পুরীষের কুক্ষিদেশে নিরোধ, হিক্কা এবং উদ্গার এই সকল লক্ষণ হইলে অলসক বলা যায়। (সুশ্রুত)

যে রোগে কফ এবং বায়ু কর্ত্তৃক আহার দূষিত হইয়া উর্দ্ধ অথবা অধোধারা নির্গত না হয়, তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বিলম্বিকা কহে। এই ব্যাধি অতিমাত্র দুশ্চিকিৎস্য। (নিদান)

ভুক্তদ্রব্য কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া উর্দ্ধ বা অধোভাগে প্রবর্ত্তিত না হইলে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়। ইহা চিকিৎসকের অসাধ্য। (সুশ্রুত)

যে বিসূচী এবং অলসকগ্রস্ত রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ হয়, মূর্চ্ছা, মোহ, বমন, ক্ষীণস্বর, ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় কোটরে প্রবেশ করে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হইবে। (নিদান)

দন্ত, ওষ্ঠ, নখ, শ্যামবর্ণ, অল্প সংজ্ঞা, বমন, নেত্রকোণ মগ্ন (চক্ষু খোলে বসিয়া যাওয়া), স্বরের ক্ষীণতা এবং সন্ধির শৈথিল্য, এইগুলি ঘটিলে বিসূচিকা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। এই লক্ষণ গুলি ঘটিলে রোগীকে কদাচই বাঁচিতে দেখা যায় না। (সুশ্রুত)

Cholera বা ওলাউঠা।

ইহা সার্ব্বভৌমিক (Epidemic) ও শীঘ্র শীঘ্র মারাত্মক।

বিশেষলক্ষণ—জলীয় ভেদ; প্রস্রাব বন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্রাব বন্ধ; টীসু (Tissue) সব ভিতর দিকে যাওয়া; খাল ধরা; এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়া।

লক্ষণ ও গতি—বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে এ রোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন ১৮১৭ অব্দে যশোহরে ইহা প্রথম দেখা দেয়। কেহ বা বলেন, মিশর দেশে ডেল্‌টাতে প্রথম দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে বর্ম্মা, চায়না, তাতার ও রুসিয়া দিয়া ইউরোপে যায়। হাম্বার্গে তিন বৎসরে ৩০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ওলাউঠার প্রথম, দ্বিতীয় বারের মল তত দূষিত নয়, কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ বারের অর্থাৎ শেষ অবস্থায় ও হিমাঙ্গ অবস্থায় যে মলত্যাগ হয়, তাহা অত্যন্ত দূষিত হয়।

সাধারণতঃ এ রোগের গুপ্তাবস্থার ঠিক নাই, কয়েক ঘণ্টা হইতে তিন দিনের ভিতরে হয়।

রোগের আরম্ভ—প্রথম কালে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়; শরীর নিস্তেজ হয়; দুর্ব্বল হয়; অসুস্থ বোধ হয়। পরে উদরাময় হয়। এই প্রকার অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থাকে অথবা দুই এক দিনও থাকে, পরে হঠাৎ যথার্থ ওলাউঠার চিহ্ন প্রকাশ পায়; ঘন ঘন মলত্যাগ হয়। প্রথমে মলে পিত্ত থাকে, পরে মল তরল হয়; সাদা মল হয়; রংহীন হয়, গন্ধহীন হয়, কেবল সাদা সাদা চর্ব্বির মত পদার্থ মলের উপর ভেসে থাকে। ভেদ অধিক পরিমাণে হয়, এমন কি ৪।৫ পাইণ্ট ভেদ হয়।

প্রথম উদরাময় হয়, পরে বমনেচ্ছা ও বমি হয়। প্রথমকার বমিতে পাকাশয়ে ও অন্ত্রে (Duodenum) যাহা থাকে, তাহা বাহির হয়। ভেদ বা বমির পর খাল (Cramp) ধরিতে থাকে। খাল উরুদেশে, পায়ের পিছনে, বাহুতে, হাতে ও তলপেটের আবরণে ধরে। প্রথমে ভেদ হয়, পরে বমি হয়, শেষে খাল ধরে। এ প্রকার অবস্থার পর হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse) হয়; এ অবস্থায় টীসু (Tissue) সমস্ত ভিতর দিকে যায়, কুঁকড়ে যায়, হাত পায়ের আঙ্গুল চুপ্‌সে যায়; চক্ষু গর্ত্তে প্রবেশ করে; চক্ষুর চারিদিক্ কাল বা নীলবর্ণ হইয়া যায়। রক্তহীনতার চিহ্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বয় এবং মৃদু (Shallow) হয়, স্বরভঙ্গ হয়, রোগী আস্তে আস্তে কথা কয়; দুর্ব্বল হয়। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত, দুর্ব্বল অথচ সূতার মত হয়। কখন কখন নাড়ী পাওয়া যায় না; যদি পাওয়া যায়? তবে মণিবন্ধে (Wrist) না পাইয়া Brachial artery-তে (ব্রেকিয়াল ধমনী) পাওয়া যায়।

উত্তাপের বিষয় (Temperature)—উত্তাপ কমে যায়, ৯৫, ৯৪, ৯২ ডিগ্রী কিম্বা ইহা অপেক্ষাও কম হইতে পারে। মুখের, বগলের ও অন্যান্য স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায়, কিন্তু মলদ্বারের (Rectum) উত্তাপ অধিক থাকে, ১০১, ১০২, ১০৫ ডিগ্রী থাকিতে পারে। ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম হয়; জিহ্বা ও শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; প্রস্রাব ও পিত্তনিঃসরণকার্য্য বন্ধ হয়। রোগীর নিদ্রা হয় না, এপাশ ওপাশ করে, হাত পা ছোঁড়ে। অত্যন্ত পিপাসা হয়; বুক জ্বালা করে; রোগী অমনোযোগী হয়, হাত এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। এই সমস্ত চিহ্ন দেখা দিলে হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse stage) হইয়াছে ভাবিবে।

তখন ভেদ ও বমি একেবারে বন্ধ হইয়া যায় অথবা কমিয়া আসে। রোগী

মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে ; মাংসপেশীর কার্য্য একেবারে দুর্ব্বল হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক থাকে। কখনও এ অবস্থায় রোগী বিছানায় উঠে বসে।

এ প্রকার হিমাঙ্গ অবস্থা ২।৩ ঘণ্টা হইতে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে, অথবা আরো অধিকক্ষণ থাকিতে পারে ; পরে (১) মৃত্যু হইতে পারে ; (২) Secondery fever (জ্বর) হইতে পারে ; (৩) ভাল হইয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে খাল ধরে না ; কাহার কাহার বা অত্যন্ত খাল ধরে ; অত্যন্ত কষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। রাজা শিববকৃস বগলার বিধবা-রাণী পরলোকগমনকালে কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকায় একটী হাঁসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটী প্রকোষ্ঠ, ঘুস্থড়ীতে একটী স্নানের ঘাট এবং ভুবনেশ্বরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

২। বরোদার মহারাজ সস্ত্রীক জাপানে গিয়াছেন। জাপান সম্রাটের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। জাপানবাসীর অভ্যর্থনায় মহারাজ প্রীত হইয়াছেন।

৩। ইংরাজী ভাষায় একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চন্দ ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

৪। আসাম-বেঙ্গল রেলপথের ৩৩ মাইল পথ জলে ভাসিয়া গিয়াছে ; জল এখনও বাড়িতেছে। দশ বারটী সেতু জল-প্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৫। কাশীর একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী বাবু মতিচাঁদ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া কাশীর মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতিনিধি হইয়া তিন জন ভারতবাসী বার্লিন নগরে গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, নববিধান সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথ লাল সেন ও সিন্ধুদেশ হইতে শ্রীযুক্ত ভাসওয়ানী প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন।

৭। মান্দ্রাজে সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যক্ষ্মারোগীদের বাসের নিমিত্ত একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করা হইবে।

৮। আগামী ডিসেম্বরমাসে এলাহাবাদে মহামেলা হইবে। ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইয়োরোপ হইতে আনীত ২ খানি পুষ্পকরথ তদুপলক্ষে আকাশপথে বিচরণ করিবে।

৯। লর্ড ও লেডি মিণ্টো "বেনারস হিন্দুকলেজে" আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর প্রতি-

মূর্ত্তির নিম্নে লেখা থাকিবে যে, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

১০। বিলাতে বিজ্ঞানবেত্তাগণ একটী অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ জীব কোন্ জাতীয়, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার মধ্যে ঘড়ির দোলকের (Pendulum) ন্যায় একখণ্ড গোলাকার বস্তু আছে; যন্ত্রটীকে পুরুষ-জাতীয় জীবের গাত্রসংস্পর্শ করাইলে ঐ দোলকটী ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে এবং স্ত্রী-গাত্রস্পর্শে উহা ঘড়ির দোলকের ন্যায় দোদুল্যমান হয়। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তি! এখন হইতে ছদ্মবেশধারণ আর চলিবে না।

১১। গত ইংরাজী ১৯০৮ সালের ছয় মাস কাল লণ্ডন সহরে ১০,০০০ (দশ সহস্র) শিশুসন্তানকে নিরামিষ আহার করান হইয়াছিল; এবং ঐ সময়ে ঠিক ঐ সংখ্যক শিশুদিগকে আমিষ ভক্ষ্য প্রদত্ত হয়; ফলতঃ ছয় মাস পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, নিরামিষাশিগণ আমিষাশী-দিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্, গুরু, দৃঢ়দেহ এবং তাহাদের চর্ম্ম আমিষাহারীদিগের অপেক্ষা পরিষ্কার। এক্ষণে লণ্ডনে বহু-সংখ্যক দরিদ্র শিশু, তত্রত্য নিরামিষ-সভা হইতে আহার প্রাপ্ত হইতেছে। মিস্ এফ. আই. নিকোল্সন্ এই সভার সম্পাদিকা।

বামারচনা।

আরাধনা।

আমি নির্জ্জনে বসিয়া পূজিব তোমায়,
　　যেরূপে পরাণ চায়,
আমি চাহিনা'ক কভু বাহিরে দেখাতে,
　　সেরূপ মাধুরী হায়!
তুমি হৃদয়-দেবতা হৃদয়ে থাকিবে,
　　উজলি হৃদয়াগার,
আমি দেখিব চাহিয়া অনিমিষ নেত্রে,
　　বহিবে প্রেমাশ্রুধার।
আমি জানিনা'ক তব স্তবন, পূজন
　　কেমনে করিতে হয়,
তাই পাগলের মত নিরজনে বসি
　　বলি যা মনেতে লয়।
আমি দেশ দেশান্তরে চাহিনা খুঁজিতে
　　তোমারে কখন হায়!
তুমি রয়েছ আমার হৃদয়ে বসিয়া
　　অন্তরঙ্গ সখা প্রায়॥
যারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বাহিরে খুঁজিয়ে,
　　তোমারে দেখিতে চায়,
দেখুক তাহারা সেই ভাবে তোমা,
　　আমি না দেখিব তায়॥

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ।

চেষ্টা।

তোমারি আলোক ধরিয়া প্রভু হে!
এ হৃদয় ভাঙ্গিয়া গড়িব,
মরমের যত পাপ-মলিনতা
প্রক্ষালিয়া সুদূরে ফেলিব।
ক্ষিপ্ত বাসনার সমাধির পাশে
আঁখিজল ফেলিব না আর;
অতীতের সুখ ফিরায়ে আনিতে
করিব না ব্যর্থ হাহাকার।
যাহা দিবে প্রভু! সহিব তাহাই,
দুঃখ-তাপে আর ডরিব না;
ঘৃণা-অপমান লাঞ্ছনার ভয়ে
সম্পদের মুখ চাহিব না।
তোমার অনন্ত মহিমা-সঙ্গীত
বিশ্বজনে শুধু শিখাব।
তোমারি নিদেশ পালিতে নিয়ত
সুখে দুঃখে হৃদি বাঁধিব।
তুমি লও প্রভু! বিষাদ-যাতনা
প্রাণে মম দাও গো শকতি,
মোহ-কুটিলতা-অন্ধকার হ'তে,
দাও মোরে চির অব্যাহতি॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

স্বর্গীয়া সুরবালা দাসীর বিয়োগ-সংবাদে শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

প্রভাতে উঠিয়া আজি কি শুনিনু হায়!
প্রিয় বৌদিদি আমার নাহি এ ধরায়।
শুনিয়া কঠোর কথা, পরাণে পাইনু ব্যথা,
শেল সম বাজে হৃদে, প্রাণ ফেটে যায়;
আর কিগো! দেখা তুমি দেবে না আমায়?

(২)

সত্যই এ ধরা ত্যজি গেছ তুমি সতী—
পাপশূন্য স্বর্গ-ধামে ওগো পুণ্যবতি!
তুমিতো গো সুরবালা, ত্রিদিবে করিতে খেলা,
সংসারের কুটিলতা সাজে কি তোমারে?
তাই ছেড়ে গেছ তুমি কুটিল সংসারে।

(৩)

ঘোর স্বার্থপর এই সংসার-মাঝারে
এসেছিলে সুরবালা! পরীক্ষার তরে।
মানবের নিষ্ঠুরতা মর্ম্মে তব ছিল গাঁথা,
কত অত্যাচার তুমি সহিয়াছ হায়!
স্মরিলে সে সব স্মৃতি, বুক ফেটে যায়।

(৪)

যাতনায় ভরা ছিল তব হৃদিখানি,
তাই অকালেতে গেলে ওগো দিদিমণি!
সহিতে না পেরে আর, ভব-দুঃখ পারাপার
স্বরগে চলিয়া গেলে আনন্দিত মনে;
আর কি হবে গো দেখা আমাদের সনে?

(৫)

হইবে হইবে দেখা, পুনঃ তব সনে,
কর্ত্তব্য সাধিয়া যবে যাব তব স্থানে।
থাক সেথা সুখে থাক, মম তরে স্থান রেখ

পবিত্র ত্রিদিব-ধাম শান্তির আলয়,
মানবের নিষ্ঠুরতা নাহিক সেথায় ।

(৬)

গোলাপ ফুটিয়াছিলে কণ্টক-উদ্যানে,
বিমোহিত ছিল সবে মধুর আঘ্রাণে,
বুকভরা ছিল দুঃখ, তবু ছিল হাসি মুখ,
বিষণ্ণ বদন কভু দেখিনি তোমায়,
হৃদয়ে রাখিতে চেপে যাতনা অপার ।

(৭)

দেখালে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা তুমি,
তোমার উদ্দেশে দেবি ! প্রণমি গো আমি ;
ভীষণ সংসারানলে, প্রাণ যবে যেত জ্বলে,
অমনি তোমার কোলে নিতাম আশ্রয়,
স্নেহ-উপদেশ দিয়া তুষিতে আমায় ।

(৮)

পাষাণ হইয়া আজি কোথায় চলিলে ?
কেমনে ছাড়িয়া গেলে শরৎ-অনিলে ?
অশ্বিনীরে গেলে ফেলে সুধাংশু যে কাঁদিছেলে
মাতৃহারা হয়ে আহা ! বাঁচিবে কেমনে ?
তার মুখ চেয়ে কি গো বাঁচিলে না প্রাণে ?

(৯)

বৃদ্ধা মাতা আজি তব করে হাহাকার,
শেল বিঁধাইয়া দিলে বুকেতে তাঁহার ।
কোমল পরাণখানি, মমতার ছিল খনি,
কেমনে নির্দয় হয়ে ত্যজিলে সবারে ;
একটু কাঁদেনি প্রাণ আমাদের তরে ?

(১০)

মরতে আসিয়া তুমি কত দুঃখ স'লে !
পরম পিতার কোলে এবে শান্তি পেলে ।
বেশ তুমি থাক সেথা, পাবে না মরম-ব্যথা,
দগ্ধ প্রাণে শান্তিধারা বহুক তোমার,
পরমেশ-পদে বোন ! প্রার্থনা আমার ।

(১১)

যাও বোন ! যাও তুমি শান্তির আলয়ে,
চিরদিন তব স্মৃতি রাখিব হৃদয়ে ।
তব ভালবাসা বোন, ভুলিতে পারে কি মন ?
তোমার পবিত্র এই মূরতি সুন্দর,
আমার হৃদয়-মাঝে রবে নিরন্তর ।

(১২)

কোমল ও তনুখানি ধীরে ধীরে ধীরে
নিষ্ঠুর মানব আহা পুড়াইল যেরে,
আহা জ্বলেছিল চিতা, গ্রাসিতে সে স্বর্ণলতা,
সেই সে সোণার তনু হায় হায় হায় !
কোন্ প্রাণে সঁপেছিল জ্বলন্ত চিতায় ।

তোমার মর্ম্মাহতা ভগ্নী
সরলাবালা ঘোষ ।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের পুণ্যস্মৃতি ।

তুমি কি গো ! আসিবে না আর,
আর কি গো ! চাহিবে না ফিরে !
স্বর্গে গেলে সকলেই কি গো !
ভু'লে যায় এই পৃথিবীরে ?
আপনার সন্তান সন্ততি,
প্রিয়জন, বিষয়-বিভব,
একবার গেলে দেবলোকে,
মানুষ কি ভু'লে যায় সব ?

সংসারের আনন্দ, উল্লাস,
ধরণীর সুখ, দুঃখ, আশ;
ধন, মান, সম্পদ, বিপদ,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
আর কি গো! কা'রো আকর্ষণে
মুক্ত আত্মা ফিরেনা পিঞ্জরে?
এত যত্নে আহরণ করি
ফে'লে যায় সব অকাতরে?
ওগো! তুমি গিয়াছ চলিয়া
কত দিন, কত বর্ষ, মাস,
একবারো আমাদের তরে
উঠেনি একটী দীর্ঘশ্বাস?
জীবনের সকল সম্মান
এক পলে কিসে টু'টে যায়?
কোন্ মন্ত্রে বুঝিতে না পারি,
শত আলো আঁধারে মিশায়!
আসিয়াছি বহু দিন পরে
আবার এ মহানগরীতে;
কত স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া
আঁখি মেলি চাহি চারি ভিতে!
আজো দেখি সেই কলিকাতা,
চারি দিকে সেই বাড়ী ঘর,
জনস্রোত বহিছে তেমনি
রাজপথ ভরি নিরন্তর।
কত আশা, কত হতাশ্বাস
পাশাপাশি ভাসিয়া বেড়ায়!
কত ধন কত দৈন্য আজো
কেহ কা'রো ফিরিয়া না চায়!
আজিও উঠিছে কত ঘরে
তেমনি আনন্দ-কোলাহল,
কত বুক ভাসা'য়ে এখনো
তেমনি বহিছে অশ্রুজল!
হায়! দেব! ভাবিতে না পারি,
সবি আছে, তুমি শুধু নাই!
আমাদের চির-বরণীয়
হৃদয়ের বিরামের ঠাঁই!
থে'কে থে'কে ভুল হয় মনে
তুমি যেন তেমনি হাসিয়া,
অকস্মাৎ পদধূলি দিতে
দাঁড়াইলে দুয়ারে আসিয়া!
এখনো আঁখির কাছে দেব,
ভাসে তব প্রশান্ত মূরতি,
ভু'লে যাই, "তুমি আর নাই",
ফিরে যায় ভাবনার গতি!
সত্যই কি আসিবে না আর,
আমাদেরে চাহিবে না ফিরে?
স্বর্গে গিয়া সত্যই কি দেব,
ভুলে গেলে এই ধরণীরে?
আপনার সন্তান-সন্ততি,
প্রিয়জন, বিষয়, বিভব,
যশ, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
সত্যই কি ভু'লে গেছ সব?

শ্রীমতীশর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

২১১৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 564 August, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১৭। আগষ্ট, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি—বিগত ১৮৯৪ সালে জাপান হইতে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধগয়াতে উহা স্থাপন করা হইবে। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারফলে ঐ প্রতিমূর্ত্তি সেখান হইতে অপসারিত করিতে হইল। সম্প্রতি কলিকাতা রিপন ষ্ট্রীট ও সারকুলার রোডের সন্ধিস্থলে ৪৬ নং বেনিয়াপুকুর লেনে বৌদ্ধগণের যে প্রচারাশ্রম আছে, সেইখানে উহা স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটি ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহাতে ভাস্করবিদ্যার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সকল সময়েই লোক যাইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে।

বিলাসিতায় নিষ্ঠুরতা—পাশ্চাত্য-দেশীয় রমণীদিগের বিলাসিতার জন্য প্রতি বৎসর কত সুন্দর সুন্দর পক্ষীর প্রাণনাশ করা হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভারত হইতে বহুল পরিমাণে পাখীর পালক বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সুদৃশ্য পক্ষিগণের পাশ্চাত্য দেশে এত অধিক সমাদর যে, তজ্জন্য কোন কোন পক্ষীর বংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি পক্ষিবিনাশনিবারণার্থ অনেকে চেষ্টা করিতেছেন। ফলের আশাও করিতেছেন। আশা করি, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে।

বাঙ্গালীর আকাশ ভ্রমণ—পাতিয়ালার মহারাজের দেহরক্ষক কাপ্তেন চাটুর্য্যি মিঃ গ্রেহেম হোয়াইট নামক একজন সাহেবের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া লণ্ডন নগরের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিমানে ভ্রমণ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলুনে আকাশপথে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছিলেন।

বিদায়-সম্মান—কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আগামী নবেম্বর মাসে বড় লাট লর্ড মিন্টোকে ভারতত্যাগের পূর্ব্বে বিদায় সম্মানে সম্মানিত করিবেন। টাউন হলে এই সভার অধিবেশন হইবে। বড়লাট বাহাদুরকে সেই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইবে।

মৃত্যু—গত ১৪ই আগষ্ট কুমারী নাইটিঙ্গেল নব্বই বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনিই ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের আহত সৈন্যদিগের সেবার জন্য গিয়াছিলেন। ইনি কাইসার ওয়ার্কে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সাধারণকে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নাইটিঙ্গেল সেবানিবাস নির্ম্মাণার্থ সাড়ে সাত লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজমাতৃদর্শন—কোচবিহারের মহারাণী সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মাতা আলেক্‌জান্দ্রার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। রাজমাতা সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামীর মৃত্যুতে তদীয় বিধবা কর্ত্তৃক তাঁহার স্মরণচিহ্ন সংস্থাপন—পরলোকগত বারিষ্টার রাজনারায়ণ মিত্রের স্মরণার্থ তাঁহার বিধবা পত্নী এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁস্পাতালে ৫ জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লরেন্‌স জেঙ্কিন্স গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। পত্নীর উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।

যুবরাজের ভ্রমণ—জার্ম্মণির যুবরাজ আগামী নবেম্বর মাসে দেশভ্রমণে বাহির হইবেন। শুনা যাইতেছে, ভারতে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা আছে।

বোম্বায়ে ঝড়বৃষ্টি—বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া রাস্তাঘাট জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, জনসাধারণকে নৌকা করিয়া বাটীর বাহির হইতে হইতেছে।

রামচন্দ্র।

সূর্য্যবংশোদ্ভব অযোধ্যাধিপতি দশরথের দেহধারী পুণ্যরাশির ন্যায় চারি পুত্র বিরাজমান হইয়াছিলেন। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এই চারি জনেরই চরিত্র লোকাতীত সদ্গুণসম্পন্ন। তন্মধ্যে রামচরিত্রের গৌরবই অধিকতর প্রসিদ্ধ। অধিক কি, মহানুভবতায় রামচন্দ্র এতদূর প্রথিতযশা যে, ভারতের আর্য্যগণ সেই পুরাকাল হইতে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারই নায়কত্বে "রামায়ণ" ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আমরা এই মহামহিম চরিত্র আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্রের বাল্যজীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাম মাতা পিতা হইতে পৌরজন, মন্ত্রী, সভাসদ্, আত্মীয়, বন্ধু, জানপদবর্গ সকলেরি অতি আদরের, অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। এরূপ আদরে সাধারণ বালকদিগের চরিত্রে যে সকল দোষ সংঘটিত হয়, রামচন্দ্রের চরিত্রে সে সকল দোষের ছায়াও স্পর্শ করে নাই। তাই তখন হইতেই তিনি বলিষ্ঠ, সুস্থ, ধনুর্ব্বেদাদিশিক্ষায় মনোযোগী; তিনি ভক্তি ও প্রীতিপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং সকল বিষয়েই সংযত।

যখন রামের বয়স একাদশ বর্ষ, তখনই তাঁহার জীবনে প্রথম পরীক্ষা। ঋষি বিশ্বামিত্র রাক্ষসসন্ত্রস্ত তপোবনের আপছুদ্ধার জন্য রামচন্দ্রের সহায়তা আবশ্যক জানিয়া দশরথের নিকটে সেই প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ তাদৃশ বিপদসঙ্কুল স্থানে জীবনের জীবন রামকে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, শেষে রাজনৈতিক চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহার রামকে দিবেন না; বিশ্বামিত্র সকল কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রামকে না লইয়া ছাড়িবেন না।

তখন রাম সকল কথা শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, বেদবিদ্যাবিৎ, যজ্ঞহোমরত সমাজশিক্ষক ঋষিগণকে রাক্ষসাদি দুরাচারদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা বাহুবলসম্পন্ন, ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ, সমাজপালক ক্ষত্রিয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন রামচন্দ্র পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। স্নেহময় পিতা ও পুত্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া প্রীত হইলেন। তখন আত্মসংযমনপূর্ব্বক প্রসন্নমনে, ঋষিকার্য্য করিতে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। যিনি এ জগতে রামের ছায়ার ন্যায়, সেই লক্ষ্মণও রামের অনুবর্ত্তী হইলেন।

এই ঋষিকার্য্যোদ্ধারের সময় মহাপ্রাণ রামচন্দ্র আর একটী কার্য্য যাহা করেন, তাহা দেবোচিত বটে। দুর্ব্বুদ্ধিবশেই হউক, আর দুরদৃষ্টবশতই হউক, ঋষিবর গৌতমের পত্নী অহল্যা সতী-ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা হইয়া পতিশাপে "পাষাণী"-রূপে বনমধ্যে পড়িয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে আবার মানবী হইয়া পতি কর্ত্তৃক গৃহীত এবং সর্ব্বপাপমুক্তা হইয়াছিলেন (১)। কবিকল্পনা ছাড়িয়া দিয়া অনুমিত হয় যে, অহল্যা সুশিক্ষিতা, সাধুসঙ্গপ্রাপ্তা, পতি ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অনুতপ্তহৃদয়ে নির্জ্জন কাননে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। তাঁহাকে পাপচিন্তা

---

(১) অহল্যার পাষাণ হওয়ার কথা পদ্মপুরাণের কথা। প্রকৃত বাল্মীকিরামায়ণে ও কথা নাই। বাল্মীকিরামায়ণে অহল্যা পতিশাপে বহু সহস্র বর্ষ বাতভক্ষ্যা, নিরাহারা, অহোরাত্র অনুতাপদগ্ধা, ও ভস্মশায়িনী হইয়া ঘোর তপস্যায় কঙ্কালশেষাবস্থায় ছিলেন। অনন্তর দয়াময় রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে পাপমুক্তা ও পূর্ব্বের সেই রমণীয় আকারে পরিণতা হইয়া পতি কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীতা হন। বা, বো, স।

ও পাপকামনামাত্র-পরিশূন্যা জানিয়া রামচন্দ্র মহর্ষি গৌতমকে অহল্যা-পুনগ্রহণে অনুরোধ করেন। এইরূপে পতি ও সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীতা হওয়াই "পাষাণোদ্ধার" বুঝিতে হইবে। জগতে যে সকল হতভাগিনী এইরূপ অনুতপ্তা, এইরূপ পবিত্রতাকাঙ্ক্ষিণী, এইরূপ প্রায়শ্চিত্তে পাপচিন্তা ও পাপকামনামাত্র-পরিশূন্যা, তাহাদিগকে "পতিতা" বলিয়া ঘৃণা ও অবহেলা না করিয়া, সমাজ যদি করুণাপূর্ণ হৃদয়ে পুনর্গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদেরও মঙ্গল হয়, সমাজেরও মঙ্গল হয়। রামচন্দ্র তাহা জানিয়াই "পাষাণোদ্ধার" করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহৃদয়তা, পাপীর প্রতি করুণা, দূরদর্শিতা এবং মহানুভাবতার অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়।

পাষাণোদ্ধার করিয়া, ঋষিগণের তপোবিঘ্নকারিণী তাড়কা রাক্ষসী ও তাহার সহচরবর্গকে বিনাশ করিয়া রাম মিথিলায় গমন করিলেন। মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের প্রতিজ্ঞা—যে তাঁহার বিশাল সুদুর্ভর বজ্রকঠিন শরাসন ভগ্ন করিতে পারিবে, সেই বীরবর তাঁহার অলৌকিকরূপগুণসম্পন্না প্রাণাধিকা দুহিতা সীতার যোগ্যপাত্র। সেই বিরাট্ মহাধনুর্ভঙ্গ করিতে অনেক প্রথিতযশা রাজা ও বীরগণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। স্বয়ং লঙ্কেশ্বর ত্রিভুবনজয়ী হইয়াও তাহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। সেই বাহুবলশালী, কৌশলী অস্ত্রচালনায় সুশিক্ষিত, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র সেই ধনুর্ভঙ্গ করিলে লোকসকল চমৎকৃত হইল। জনক তাঁহার ধনুর্ভঙ্গপণের সম্পূর্ণ সার্থকতা জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন।

রাজা দশরথ এই সংবাদ পাইয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে মিথিলায় উপস্থিত হইয়া রাজর্ষি জনক ও তাঁহার অনুজ কুশধ্বজের চারি কন্যার সহিত, মহাসমারোহে নিজ চারি পুত্রের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাম-সীতার এই মিলন মণি-কাঞ্চনযোগের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল।

এই শুভ অনুষ্ঠানের পরে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনসময়ে পথিমধ্যে এক বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কুলান্তক অজেয় মহাবীর পরশুরাম রামের সহিত সংগ্রামপ্রার্থী হইয়া আনন্দোৎসবের মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেন। সেই দিগ্বিজয়ী বীরের সহিত বালক রামকে যুদ্ধ করিতে দিতে রাজা দশরথের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু রামের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং উপায়ন্তর অভাবে সেই ভয়াবহ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু যে দিন দিগ্বিজয়ী বীর ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট ওয়াটালু'য় যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয়রূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলান্তক মহাবীর পরশুরামও অযোধ্যার পথে রামচন্দ্রের

হস্তে সেইরূপ অভাবনীয়রূপে পরাজিত হইলেন। সকলে কিশোর রামের এই পরাক্রম, এই অত্যদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্রের সুখ-শান্তির সহিত কিছু দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। মাতা পিতার অপরিসীম স্নেহ, ভ্রাতৃগণের,বিশেষতঃ লক্ষ্মণের আত্ম-হারা প্রীতি, পত্নীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম, গুরুজনবর্গের মমতা এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, নিজের সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ, কান্ত রূপ; অতুলনীয় বিদ্যা বুদ্ধি; নির্ম্মল চরিত্র; নিষ্পাপ হৃদয়; ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, ধন, মান, শৌর্য্য, বীর্য্য সমস্তই অনন্যসাধারণ। যাহা কিছু সুখের, যাহা কিছু গৌরবের উপাদান, বিধাতা রামকে তাহা সমস্তই দিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সুখ বা শান্তির অভাব কিসে?

কিন্তু এ জগতের রীতি এই যে, যাঁহারা "মহাত্মা" বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের অদৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি ভোগ কখনও ঘটে না। হরিশচন্দ্র, শ্রীবৎস, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হইতে আজিকার মানব পর্য্যন্ত এই সাধারণ নিয়মের অধীন। সেই জন্য আমরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাত্মা রামচন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখিয়া, আর যাহাই হই, বিস্মিত হইব না।

রাম-জীবনের এক প্রধান ঘটনা তাঁহার নির্ব্বাসন। রাজা দশরথ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম, সুযোগ্য সুকৃতী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতেছেন, এ সংবাদে আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী, জনসাধারণ সকলেই আনন্দোৎফুল্ল হইয়াছেন, অযোধ্যা নগরীতে আনন্দস্রোত লহরে লহরে ছুটিতেছে। কৌশল্যা দেবী পুত্রের মঙ্গলার্থে ভগবদারাধনা করিতেছেন; প্রভাত-রবিকর-রঞ্জিত নবস্ফুট শতদলের মত নববধূ জানকী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। রামের প্রাণের ভাই—আনন্দোৎফুল্ল লক্ষ্মণ যেন কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অধিক কি, সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে, চিরসংযমী রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—"আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি *। কিন্তু এ আনন্দ, এ উৎসব কতক্ষণ?

রাজা দশরথ বহুবিবাহকারী হইয়া, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীতে সর্ব্বাপেক্ষা অনুরক্ত ছিলেন। কৈকেয়ী চরিত্র আলোচনা করিলে অনুমিত হয়, কৈকেয়ী সরলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা হইয়াও অপরিণামদর্শিনী, পরবুদ্ধি-অনুবর্ত্তিনী এবং অমিমৃষ্যকারিণী ছিলেন। বোধ হয় পতির অত্যধিক আদরে প্রশ্রয় পাইয়াই তাঁহার শেষোক্ত দোষটী ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কৈকেয়ী কোন দিন রামের প্রতি ঈর্ষান্বিতা ছিলেন না। বরং রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক রূপ শুভ সংবাদে কৈকেয়ী এত আনন্দিতা হইয়াছিলেন যে,

* "জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থে ময়ি কাময়ে।"

সংবাদবাহিনীকে বিশেষ পুরস্কৃতা করিতে উদ্যতা হন। কিন্তু পরদ্বেষিণী, কূটবুদ্ধিশালিনী পরিচারিকা মন্থরা বহু আয়াসে, অশেষ কৌশলে ও অদ্ভুত কূটবুদ্ধির মায়াজাল বিস্তার করিয়া কৈকেয়ীর মন ফিরাইতে পারিয়াছিল। এ জগতে দুষ্টের কুমন্ত্রণায় ও পার্থিব প্রলোভনে সময়ে সময়ে দেবগণ ও মহাতপা যোগিগণও প্রমুগ্ধ হন। যেন কৈকেয়ীর মাথায় একটা ভূত চাপিয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতির একেবারে বিপ্লব ঘটাইল! সরলহৃদয় প্রেমমুগ্ধ দশরথের প্রতিজ্ঞা পালনছলনায় কৈকেয়ী ভরতের চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপ্রাপ্তি এবং রামের চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিল। সেই বজ্রাহতপ্রায় স্বামীর অনুনয় বিনয়, রোষ, তিরস্কার, আকুলতা, উন্মত্ততা, কৌশল্যার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা, সপত্নীগণের বিলাপ সভাসদ, রাজপুরুষ, পুরাঙ্গনা এবং অযোধ্যাবাসী ব্যক্তিমাত্রের প্রতীকারপ্রার্থনা সমস্তই বিফল হইল। তখন কৈকেয়ী সমস্ত অনর্থ বুঝিতে পারিয়াও স্বীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিতে রামের নির্ব্বাসনই স্থির করিল।

এই দারুণ দুর্ঘটনায় দশরথ কৌশল্যা হইতে অযোধ্যার সমস্ত জনমণ্ডলী বজ্রাহতের ন্যায় সন্তাপদগ্ধ হইতে লাগিল। মন্থরা ও কৈকেয়ী ভিন্ন সকলেই জীবন্তে মরণাধিক ক্লেশ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু যাঁহার জন্য সকলের এই ভয়ানক মনস্তাপ, সকলের হৃদয়ে অগ্নিকাণ্ড, সেই রামচন্দ্র কি করিতেছিলেন? তিনি এই দুঃসহ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়াও স্থির, ধীর, কাতরতাশূন্য। যেন স্থির, গম্ভীর অক্ষুব্ধ জলধি। তিনি বিধাতার উপরে অভিমানী হইলেন না, পিতার প্রতি ভক্তিশূন্য হইলেন না এবং দুর্দ্দশার মূল কৈকেয়ীর প্রতিও বিন্দুমাত্র অপ্রসন্ন হইলেন না। স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্তিবশতঃ রামের মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন নিরপরাধ পুত্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস, রামময়জীবিত লক্ষ্মণের ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয় হইয়াছিল। এ রকম পিতৃসত্য পালন করা যে গুরুতর অধর্ম্ম, এ কথা সেই তেজস্বী বীর, অগ্রজকে বিধিমত বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদুত্তরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোনও অসঙ্কল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় স্নেহ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহাকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়া দান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ অঙ্গীকারে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোনও হাত নাই।" তেমন সময়ে এমন কথা বলিতে পারেন বলিয়া, কৈকেয়ীর মত অপরাধিনীকে এমন সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা

করিতে পারেন বলিয়া, এইরূপ বীশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া রামচন্দ্র জগতের পূজ্য, রামচন্দ্র দেবতা। রাম বিমাতাকে বজ্রনাদে বলিয়াছিলেন,—কি তুচ্ছ বনবাস! আমি পিতার আজ্ঞায় অম্লানচিত্তে তীক্ষ্ণ হলাহল পান করিতে পারি, সমুদ্রে ডুবিয়া বা অনলে দগ্ধ হইয়া বা শস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিতে পারি।

ইহার পরেও রামচন্দ্র শোকাকুল পিতামাতাকে সান্ত্বনা করিলেন, প্রিয় পত্নী ও ভ্রাতাকে বহুবিধ সদুপদেশ দিলেন, তাঁহার জন্য দুঃখাকুল প্রজাবর্গকে প্রবোধ দিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু রামের গুণে, অন্য কথা কি, অযোধ্যায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশীভূত, রামের জন্য দশরথ মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হইলেন, কৌশল্যা জীবন্মৃতা হইলেন, বিমাতারা হাহাকার করিতে লাগিলেন, জনমণ্ডলীর আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের সহিত বনবাসী হইতে চলিলেন, কোনও নিষেধ তাঁহারা পালন করিতে সক্ষম হইলেন না। প্রজাগণ রামচন্দ্রের রথচক্র ধরিয়া সারথি সুমন্ত্রকে অনুনয় করিতে লাগিল—"সূত! অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে থাক, আমরা রামের মুখখানি আরও একটু দেখি, আর আমাদের উহা সহজে দেখা ঘটিবে না"। রামচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বসাধারণের কি অনির্ব্বচনীয় অনুরক্তি, এই শেষোক্ত কথাটীতে তাহা বোধগম্য হয়।

এইখানে আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার গগনে চন্দ্রোদয় হইলে, সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া দিঙ্মণ্ডল যেমন জ্যোৎস্নালোকে হাসিতে থাকে, রামচন্দ্রের চিত্রকূটে বাসকালে যখন শোকজলিত, আত্মত্যাগী, জটাবল্কলধারী, দীন, নিরপরাধ ভরতকে অগ্রজের পদতলে বিলুণ্ঠিত দেখিতে পাই, তখন কৈকেয়ীর দুরপনেয় কলঙ্ক যেন কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষে অপূর্ব্ব শান্তিময় আলোক উদ্ভাসিত হইতে থাকে। লক্ষ্মণ সত্যই বলিয়াছেন "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এমন নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

যাহা হউক, রামপ্রীতির জন্য যে ভরত অগ্রজের পাদুকা মাত্র সিংহাসনে রক্ষা করিয়া নিজে নির্লিপ্ত ব্রহ্মচারিরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রাণ অনুজের প্রতিও রামচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ণ স্নেহ দেখিলে সে অলৌকিক প্রীতির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

ভরত রামকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করেন নাই। সুদূর নন্দিগ্রামে সিংহাসন আনিয়া, তদুপরি রামপাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতায় তদুপরি ছত্রচামর ধারণপূর্ব্বক ঐ পাদুকার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য করিতেন।

বনবাসকালেও রামচন্দ্রের অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি

অযোধ্যার সম্রাট্‌পদে বৃত হইতে হইতে বনবাসী হইয়াছেন, সেই রাজসুখভোগাসক্ত যুবক, অনুজ ও ভার্য্যার সহিত, বনচারী ঋষিকুমারের ন্যায় বনবাস-কষ্ট সহিতে লাগিলেন। তাপসজনোচিত পর্ণকুটীরে বাস, ফলমূলাদি আহার এবং তৃণশয্যায় শয়ন. প্রভৃতি কিছুতেই রামের চিত্ত বিক্ষোভিত হয় নাই। যখন আমরা দেখিতে পাই, কখনও রাম লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়া করিতেছেন, কখনও সীতার সহিত রমণীয় কান্তারে বসিয়া মধুরালাপ করিতেছেন, কখনও বা ধর্ম্মাত্মা ঋষিদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তখন আমরা বিস্মিত হই, মুগ্ধ হই, রাজপুত্র যে বনবাসী হইয়াছেন, সে কথাও ভুলিয়া যাই!

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার। (১)

প্রায় ৪০ বর্ষ গত হইল, মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকট কোনও স্থানে এ ঘটনা হয়। তত্রত্য পুলিস ইনিস্পেক্টার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রমুখাৎ এ ঘটনা শ্রুত। তিনি সে সময় স্বয়ং এ ঘটনার তদন্ত করিয়াছিলেন। যথাশ্রুত লিখিতেছি।

মাণিকগঞ্জের এলাকায় কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র। পুত্রটী তরুণবয়স্ক। এ ঘটনার পূর্ব্ব বর্ষে ৯।১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোনও গ্রামে পুত্রটীর বিবাহ হইয়াছিল। তদবধি ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে গৃহে আনেন নাই। পুত্র ঢাকার কোনও জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করে। এবার শারদীয়া পূজায় কয়েক মাসের ছুটি লইয়া পুত্র গৃহে আসিবে। এজন্য ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে গৃহে আনিবার জন্য, বৈবাহিকের বাটীতে গেলেন। তথায় কয়েক দিন থাকিয়া, পাল্কিতে বধূ লইয়া, বেহারাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও সে স্থান হইতে গৃহ প্রায় ৪ ক্রোশ। বেহারারা ক্লান্ত হইয়া, কোনও গ্রামের সন্নিহিত প্রান্তরে, অশ্বত্থতলে পাল্কি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। অদূরে বৃহৎ জলাশয় ছিল। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে বলিলেন, মা! যদি হস্ত মুখ প্রক্ষালনের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ সম্মুখস্থ জলাশয়ে যাইতে পারেন; নির্জ্জন ও পরিষ্কৃত স্থান। কাছেই আমরা আছি, কোন ভয় নাই। জলপূর্ণ পাত্র

---

(১) বামাবোধিনীর দয়াময়ী পাঠিকাগণকে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক কথা শুনাইতে প্রতিশ্রুত আছি। "বিবিধ ব্যঞ্জন" ভোজনকালে চাটুনি চাই। ইহাও তাই।

লইয়া বধূ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী একটী ঝোপের কাছে গেলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তিনি ফিরিলেন না। তখন বেহারারা ঝোপের নিকটে গিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সাড়া নাই। তখন তাহারা ঝোপের মধ্যে ও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করত, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। কোনও উদ্দেশ নাই। সকলে ভীত হইল, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ভয় ও আবেগের পরিসীমা নাই। সেই স্থান ও তাহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ছুটাছুটি ও ডাকাডাকি করিয়া কোনও উদ্দেশ পাইলেন না। তখন, "বৌমা কোথা গেল! আমার সর্ব্বনাশ হইল!" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি উন্মত্তবৎ উদ্দাম-ভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিলেন। ভূতলে বারংবার পতনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ ও ধূলিধূসরিত হইল। মুখ দিয়া ফেনা পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও বিদীর্ণ কণ্ঠে হাহাকার! ফলতঃ ব্রাহ্মণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইল। ঐ স্থান একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। সন্ধ্যা উপস্থিত। জনসঞ্চার বিরল। কেহ তাঁহাকে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি উন্মত্তপ্রায় কেবল হাহাকার এবং শিরে ও বক্ষে করাঘাত করেন। এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে তিনি এক স্থানে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পাল্কির বেহারারা তাঁহার বৈবাহিকের প্রজা, তাঁহাকে তদবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারে না। তাহারাও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি ও হাঁকাহাঁকি করিয়া শেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই ঘোর সঙ্কটে এক বৃদ্ধা আসিয়া বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? ইনি কে? তোমরা পাল্কি লইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? তাহারা সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তখন বৃদ্ধা অতি যত্নে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অদূরেই তাঁহার গৃহ। গৃহ মৃণ্ময় হইলেও পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। চৌদিকে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর। বাটীখানি উত্তম উত্তম আম্র-কাঁটাল-নারিকেল-কদলী ও বিল্ববৃক্ষশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। উহার চতুর্দ্দিকে কোথাও বিন্দুমাত্র আবর্জ্জনা নাই। সম্মুখবাটীর ভিত্তিসংলগ্ন উচ্চ ও সুমার্জ্জিত দাওয়া। অন্দরের একটী ঘরের দ্বার ও গবাক্ষ বহির্ভাগে থাকায়, তাহাই আগন্তুকদিগের থাকিবার স্থান। বৃদ্ধা পরম যত্নে ব্রাহ্মণের বদনে ও মস্তকে শীতল জল দিয়া, বীজন করিয়া, বহুক্ষণে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা-লাভ করিয়াই হাহাকার করিয়া বৃদ্ধার পদতল জড়াইয়া ধরিলেন। বৃদ্ধা শিহরিয়া তাঁহার হস্ত হইতে আত্মমোচনপূর্ব্বক বলিলেন,—ঠাকুর! আপনি একেবারে জ্ঞানশূন্য। এরূপ অবস্থায় এ বিপদুদ্ধারের কোনও উপায় করা অসম্ভব। যদি আপনি স্থির হইয়া আমার কথা শুনেন, ঠিক্ আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তবেই আপনার বিপদুদ্ধারের চেষ্টা করি। নহিলে, আপনিও মারা যাইবেন,

আপনার বধূমাতারও উদ্ধার হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া আমার কথা শুনিলে, আপনার বিপদ্ কাটিবে। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিশুর ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধা তাঁহাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে আপন বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক, তাঁহাকে পরিষ্কৃত শয্যায় বসাইলেন। অনন্তর সুমধুর বিবিধ ফল ও দুগ্ধাদি দিয়া তাঁহাকে জল খাওয়াইলেন। তিনি সে রাত্রিতে আর কিছুই আহার করিতে চাহিলেন না। তখন বৃদ্ধা পাল্কির বেহারাদিগকে প্রচুর তণ্ডুলাদি দিয়া তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আপনি স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। আমার পুত্র আসিলে, উপায় হইবে।

বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম গোপালদাস সরকার। জাতিতে কায়স্থ। গোপাল বিবাহ করিয়াছিলেন, পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছে। তদবধি আর তাঁহার বিবাহে মতি নাই। সমস্ত জীবন মাতৃসেবায় ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মে অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা। কিন্তু তদীয় একপুত্রা জননী ছাড়িবেন না. নিজ শ্বশুরবংশের পিণ্ডলোপ তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন? এজন্য মাতাপুত্রে বাদানুবাদ চলিতেছিল। শেষে মাতৃশক্তিরই জয় হইল। সেই মাসেই গোপালের বিবাহ স্থির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের এই দুর্ঘটনার পরদিন তাঁহার গাত্রহরিদ্রার কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণের বিপদুদ্ধার যাবৎ না হয়, তাবৎ তিনি বিবাহে ক্ষান্ত থাকিবেন, সংকল্প করিয়া গাত্রহরিদ্রা স্থগিত রাখিলেন। গোপাল স্থানীয় তালুকদারের খাজনা তসিল করেন। প্রত্যূষে উঠিয়া সামান্য জলযোগমাত্র করিয়া, তাঁহাকে নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক খাজনা আদায় করিতে হয়। বাটী ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১০টা, ১১টা হয়। আসিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক অন্নভোজন করেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাটী ফিরিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্র আসিলেই তাঁহার বিপদুদ্ধারের উপায় হইবে। এজন্য তদীয় আগমন প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণের শয্যাকণ্টকী হইয়াছিল।

"পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্"

এই ভাবে তিনি গোপালের আগমন-প্রতীক্ষায় দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গোপাল দুইজন পাইকের সহিত গৃহে উপস্থিত হইয়াই মাকে ডাকিলেন। বৃদ্ধা আস্তে ব্যস্তে আসিয়া. পুত্রকে লইয়া. অন্তরালে গিয়া সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন।

অনন্তর গোপাল ব্রাহ্মণের মুখেও সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর সে স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া, কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিলেন,—ঠাকুর! স্থির হউন, ভয় নাই, বিপদ্ কাটিবে, আপনার বধূমাতা জীবিত আছেন।

তাঁহার উপর কোনও অত্যাচার হয় নাই। তাঁহাকে আপনি নিশ্চয় পাইবেন। আমার এই বিদ্যা গুরুর কৃপায় কখনও ব্যর্থ হয় নাই। আজি বুধবার। শনিবার, বোধ করি, কোনও উপায় করিতে পারিব। হয়ত, আরো সময় লাগিবে। কিন্তু আপনাকে এ বিলম্ব অতি ধীরভাবে সহ্য করিতে হইবে। বিপদে ধৈর্য্য চাই। বিশেষতঃ এ অতি ভয়ানক বিপদ্! আপনি এরূপ অধীর হইলে, আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। আপনি এ কয়দিন প্রত্যহ সেই স্থানে গিয়া, সেই দুর্ঘটনাস্থান ও তাহার ইতস্ততঃ প্রত্যেক স্থান নিপুণভাবে দেখিয়া রাখুন। ব্রাহ্মণ তদীয় উপদেশ পালন করিতে লাগিলেন। তিনি সে সকল স্থানে বারংবার গিয়া তথাকার বৃক্ষ লতা-গুল্মাদি প্রত্যেক পদার্থ নিশানা করিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও বক্ষঃপ্লাবিনী অশ্রুধারার সহিত এক এক দিন এক এক যুগের ন্যায় কাটিতে লাগিল। তিনি মনে মনে অহোরাত্র কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ ও সেই সঙ্কটহারী, অগতির গতি বিশ্বপতিকে ডাকিতে লাগিলেন। এই কয় দিনেই তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইল। যেন জন্মান্তর উপস্থিত। ব্রাহ্মণের জলন্ত-চুল্লীবৎ দহ্যমান হৃদয়ের অগ্নিময় শ্বাসপরম্পরায় দগ্ধ হইয়াই যেন দিনগুলা অদৃশ্য হইল।

আজি শনিবার। ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব রাত্রিতে একটীবারও আলস্য রাখেন নাই। সারা রাত্রি সঙ্কটহারিণী, দীনদয়াময়ী বিশ্বজননীকে অশ্রুসিক্তবক্ষে, কাতরপ্রাণে ডাকিয়াছেন। এ কয় দিন গৃহস্থের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধে ভোজন কেবল নামমাত্র করিয়াছেন।

সে দিন, গোপাল কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাকালেই গৃহে ফিরিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া, নিশীথে তাঁহার হস্তে, ভূর্জ্জপত্রে কি লিখিয়া দিলেন। তাহা অন্যের দুর্ব্বোধ। অক্ষরগুলি সাঙ্কেতিক। অনন্তর তাঁহার মস্তকে মন্ত্রপূত জল ছিটাইয়া, এবং তদীয় বস্ত্রপ্রান্তে একটী নির্ম্মাল্য বন্ধনপূর্ব্বক, বলিলেন,—ঠাকুর! এক্ষণে আপনি নির্ভয়ে, মহাসাহসে বুক বাঁধিয়া, সেই স্থানে গমন করুন। দীর্ঘিকাতটে সেই জোড়া তালগাছের পশ্চাতে থাকিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকুন। রাত্রি দুই তিনটার সময় দেখিবেন,—দূর হইতে আলোকমালা ক্রমশঃ পুষ্করিণীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। উহা আপনার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবে। যে দৃশ্য দেখিবেন, তাহাতে যদি আতঙ্ক প্রকাশ করেন বা চিৎকার করেন, মারা পড়িবেন। নির্ভয়ে সাহসে নির্ভর করিলে ও মনে মনে একান্তভাবে ভগবান্‌কে ডাকিলে, কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই।

ব্রাহ্মণও মরিয়া; অসম সাহসে নির্ভর করিয়া, সঙ্কটনাশিনী ব্রহ্মময়ীকে মনে মনে ডাকিতে ডাকিতে হন্ হন্ করিয়া

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সে সময় রজনী ঘোরা। চরাচর নিস্তব্ধ। নৈশ সমীরণের হিল্লোলে উত্থিত, তালবৃক্ষের মর্ম্মর-পত্রধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির গম্ভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে। আম্র-বট-অশ্বথ-বকুলাদি বৃক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতিকা জ্বলিতেছে। ইতস্ততঃ বাঁশঝাড়-গুলি, আপাদমস্তক, ওতপ্রোতভাবে, স্তিমিত-দীপ্ত খদ্যোতালোকে, যেন এক একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়-কারু-খচিত-সহস্রশাখ ঝাড়লণ্ঠনের ন্যায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে! নিঃশব্দ-গভীর নিশীথে গ্রাম্য কান্তারের তরুরাজিতে সেই খদ্যোতশোভা হেরিলে, অনন্ত সৌন্দর্য্যের —অনন্ত বৈচিত্রের মহাসিন্ধু জগদ্বন্ধুর অপার মহিমায় যাহার মন-প্রাণ উচ্ছলিত না হয়, সে হতভাগ্য লৌহ-কাষ্ঠ পাষাণা-পেক্ষাও কঠিন।

"মাণিক্যখণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈর্নিচিতানগম্যাঃ।
বনদ্রুমান্ বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে
স্মরামি তে মূর্ত্তিমপূর্ব্বরূপাম্॥"

(সংস্কৃত কৃষ্ণভক্তিরসামৃত।)

—গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্য খণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বন-বৃক্ষসকল আপাদমস্তক ক্ষণে ক্ষণে প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন, হরি হে! হৃদয়মধ্যে তোমারি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করি (১)।

(ক্রমশঃ)

(১) জোনাকিরা অবিরাম জ্বলে না। মিট্ মিট্ করিয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলে। উহাতে একাধারে মুহুর্মুহুঃ আলো-আঁধারের ধারাবাহিক পর্য্যায় থাকায়, উহা অধিকতর রমণীয় দেখায়।

নীতিস্তবক।*

যদা কিঞ্চিজ্জ্ঞোঽহং দ্বিপইব মদান্ধঃ সমভবম্
তদা সর্ব্বজ্ঞোঽস্মীত্যভবদবলিপ্তং মম মনঃ।
যদা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ বুধজনসকাশাদধিগতং
তদা মূর্খোঽস্মীতি জ্বর ইব মদো মে ব্যপগতঃ॥ ১॥

—বিন্দুমাত্র জ্ঞান মোর না ছিল যখন,
মত্ত ছিনু মদে অন্ধ মাতঙ্গ যেমন,
তখন সর্ব্বজ্ঞ আমি এই অহঙ্কার—
উত্তপ্ত করিত মন-মস্তিষ্ক আমার,
গুরুর কৃপায় কিছু জনমিলে জ্ঞান,

* আমার "বিবিধ ব্যঞ্জন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, যাঁহারা এ বৃদ্ধ লোভী ব্রাহ্মণকে ছানা-মুড়কি, বড়ি, শাক-ডাঁটা প্রভৃতি উপহার দিয়াছেন, দয়াময়ের চরণে উন্মুক্ত প্রাণে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌভাগ্য প্রার্থনা করতঃ এই কয়েকটী প্রাচীন শ্লোক, অনুবাদ সহ, তাঁহাদের পবিত্র করকমলে উপহার দিলাম। এ সকল আমাদের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি, খাঁটি স্মরণীয় দ্রব্য। ইহার সেবনে দেহ-মন-আত্মা হৃষ্টপুষ্ট হয়। পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়।

ঘুচিল বিকারসম মম অভিমান ;
এখন ভাবিয়া আমি দেখি মনে মনে,
আমা হেন মূর্খ কেহ নাহি এ ভুবনে ।১।

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং ;
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ং ।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ২ ॥

—ভোগে রোগভয়, কুলে কলঙ্কের ভয়,
ধনে রাজভয়, মানে দৈন্যভয় রয়,
বলে রিপুভয়, রূপে তরুণীর ভয়,
শাস্ত্রে বাদিভয়, গুণে খলভয় রয়,
দেহে যমভয়, ভবে সকলেই ভয়,
বৈরাগ্যই, একমাত্র সর্ব্বত্র অভয় ।২।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ ভয়ং ।
ভক্তির্ঘূর্ণ শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যত্র-বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥ ৩ ॥

—ইন্দ্রিয়দমনে শক্তি, সাধুসঙ্গে বাস,
হেরিলে পরের গুণ হৃদয়ে উল্লাস,
বিদ্যায় আসক্তি, গুরুসকাশে বিনয়,
সভার্য্যায় রতি, লোক-অপবাদে ভয়;
ঈশ্বরে ভকতি, দুষ্টসঙ্গ-পরিহার,
হেন গুণাধারগণে করি নমস্কার ।৩।

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানস । চাপলেন
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মলীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি কেন ? ॥৪॥

—রে চপল মন ! কর পাতালে প্রবেশ
ঊর্দ্ধে বা ভ্রমহ তুমি লঙ্ঘি' নভোদেশ,
আত্মমধ্যে নাহি যদি স্মর পরমেশ,
ত্রৈলোক্যে কোথাও নাহি পাবে শান্তি-লেশ । ৪ ।

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী
রোগাশ্চ শত্রবইব প্রহরন্তি দেহে ।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভঃ
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ ॥৫॥

– ব্যাঘ্রীসম জরা ওই করিছে তর্জ্জন,
জর্জ্জর করিছে দেহ রোগ-শত্রুগণ,
ভগ্ন ঘটে বারিসম ফুরায় জীবন,
কি আশ্চর্য্য ! তবু লোক পাপে দেয় মন । ৫ ।

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রীঃ
অর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপুগাঃ ।
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরন্তঃ ॥৬॥

সলিলে তরঙ্গসম চঞ্চল জীবন,
কতিপয় দিনমাত্র রহে এ যৌবন,
ক্ষণিক কল্পনাসম ধন পায় লয়,
জলদে চপলাসম ভোগসমুদয়,
তরিতে এ শোকসিন্ধু ভীষণ সংসার—
কর রে ! তারকব্রহ্ম ধ্যান-জ্ঞান-সার ।৬।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু

লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ধর্ম্ম্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥৭॥
—নীতিজ্ঞ করুন নিন্দা কিম্বা গুণগান,
কমলা আসুন কিম্বা করুন প্রস্থান,
অদ্যই হউক কিম্বা যুগান্তে মরণ,
ধর্ম্মপথ হ'তে কভু না টলে সুজন। ৭।
জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন হিতং করোতি॥৮॥
—বুদ্ধির অশেষ দোষ করে নিবারণ,
বচনে সুনৃতসুধা করে বরষণ,
পাপতাপ-মলিনতা করে বিদূরিত,
সুকীর্ত্তি-গৌরবে দিক্ করে প্রপূরিত,
হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি করে বিতরণ,
সাধুসঙ্গ কি মঙ্গল না করে সাধন ? ।৮।
তৃষ্ণাং ছিন্ধি ভজ ক্ষমাং জহি মদং
পাপে রতিং মা কৃথাঃ
সত্যং ব্রূহ্যনুযাহি সাধুপদবীং
সেবস্ব বিদ্বজ্জনান্।
মান্যান্ মানয় বিদ্বিষোঽপ্যনুনয়
প্রচ্ছাদয় স্বান্ গুণান্
কীর্ত্তিং পালয় দুঃখিতে কুরু দয়া—
মেতৎ সতাং চেষ্টিতম্ ॥৯॥
—ত্যজ তৃষ্ণা, ক্ষমাগুণ করহ আশ্রয়,
অভিমান, পাপবুদ্ধি দূরে যেন রয়,
সত্যের করহ রক্ষা সদা প্রাণপণে,
সাধুপথে চল, ভজ জ্ঞানী-গুণিগণে,
নিজগুণ কদাচ না করিও কীর্ত্তন,
শত্রু প্রতি কর সুমধুর আচরণ,
দীনে দয়া, কীর্ত্তিরক্ষা, ভক্তি গুরুজনে—
সাধুর চরিত ইহা পালিও যতনে।৯।
পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি
চন্দ্রো বিকাসয়তি কৈরবচক্রবালং
নাভ্যর্থিতেঽপি জলদঃ সলিলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু সদা নিযুক্তাঃ ॥১০॥
দিবাকর নিশাকর হ'য়ে অযাচিত—
কমল-কুমুদকুল করে বিকসিত,
অযাচিত মেঘ দেখ ! সলিল বিতরে,
সাধুরা স্বতই ব্যগ্র পরহিত-তরে।১০।
বহ্নিস্তস্য জলায়তে জলনিধিঃ
কূপায়তে তৎক্ষণাৎ
মেরুঃ স্বল্পশিলায়তে মৃগপতিঃ
সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে।
ব্যালো মাল্যগুণায়তে বিষরসঃ
পীযূষবর্ষায়তে।
যস্যাঙ্গেঽখিললোকবল্লভতমং
শীলং সমুন্মীলতি ॥১১॥
পুণ্যময় বিশ্বহিত চরিত্রের বলে—
বলীয়ান্ যেই জন হয় মহীতলে,
প্রচণ্ড অনল তার সলিল শীতল,
কূপতুল্য তার কাছে সমুদ্র অতল,
সুমেরুও তার কাছে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড,
মৃগসম তার কাছে কেশরী প্রচণ্ড,
পুষ্পহার সম তার কাল ভুজঙ্গম,
বিষরস তার কাছে অমৃতের সম।১১। (১)
বরং তুঙ্গাচ্ছৃঙ্গাদ্‌গুরুশিখরিণঃ
ক্বাপি পুলিনে

(১) ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, হরিদাস প্রভৃতি।

পতিত্বায়ং কায়ঃ কঠিনদৃষদস্তর্বিদলিতঃ।
বরং ন্যস্তো হস্তঃ ফণিপতিমুখে তীব্রদশনে
বরং বহ্নৌ পাতস্তদপি ন কৃতঃ
শীলবিলয়ঃ ॥ ১২ ॥

—উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হ'তে হইয়া পতিত,
কঠিন প্রস্তরে দেহ কর বিচূর্ণিত,
বাড়াইয়া হস্ত কালসর্পের বদনে
বরঞ্চ মৃত্যুও ভাল সে বিষদশনে,
বরঞ্চ অনলে ভস্ম কর নিজ দেহ,
তথাপি চরিত্রহীন না হইও কেহ। ১২।

অমৃতং কিরতি হিমাংশুর্বিষমেব ফণী
সমুদ্‌গিরতি।
গুণমেব বক্তি সাধুর্দোষমসাধুঃ
প্রকাশয়তি ॥ ১৩॥

—সুধাকরে ক্ষরে সদা সুধাময় কর,
গরল উগারে শুধু কাল বিষধর,
সুপবিত্র ভাব সদা প্রকাশে সুজন,
প্রকাশে দূষিত ভাব দুষ্টমতিগণ। ১৩।

সাধোঃ পরার্থৈকফলং চরিত্রং
মধু ক্ষরত্যেব বিনাশকেঽপি।
অপূর্ব্বসৌরভ্যসুধাপ্রদানৈঃ
ছেত্তুর্মুদং চন্দন আতনোতি ॥ ১৪ ॥

—পরহিতসাধনাই সাধুর স্বভাব,
প্রাণঘাতকেও তার কি মধুর ভাব!
খণ্ড খণ্ড করি' যেই করিছে ছেদন,
পুলকিত করে তারে সৌরভে চন্দন।১০।

(ক্রমশঃ)

বিধবা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যে ভাবেই কেন চিন্তা করি না, একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, স্বামী আর ভগবান্ একই বস্তু, স্বামি-ভাবে ভগবচ্চিন্তা করি অথবা তাহার বিপরীত ভাবি, মূলে সবই এক। অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করি, বা জ্ঞানীর জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করি, মূলে একই। স্বামীই ভগবান্, এই ভাবে সকলের বিশ্বাস করা অসম্ভব হইলেও স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবই সেই এক অচিন্তনীয় চৈতন্যময় ভগবানে অবস্থিত। জড়-চৈতন্য সবই সেই অদ্বিতীয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মা ছাড়া এ জগতে কিছুই নাই। তিনি পতিপুত্রাদিরূপে আমাদের নানা-ভাবে উপভোগ করাইতেছেন। ইহা জ্ঞানী মহাজনদের উপলব্ধি করিবার কথা। এখন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কত

বড় বড় মহাজনগণ জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। আমরাও যদি মহাজনপথ অবলম্বন করি,

তাহা হইলেও মূলে একই হইবে। তবে কিনা আমরা জ্ঞানবুদ্ধিহীনা মোহান্ধা রমণী, আমরা অতশত সকলে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে না পারিলেও, ইহা সকলেই বুঝিতে পারি যে, সমগ্র জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা-ভোক্তা সেই ভূমা পরমেশ্বর। ভূত, চৈতন্য সবই যদি তিনি, তবে স্বামি-নামধারী আমাদের উপাস্য দেবতাও সেই অনন্ত পরমাত্মারই এক অংশ। ইহা ত আর কল্পনা নহে। ইহা নিত্য সত্য।

পূজা ধ্যান ধারণা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া করিতে হয়। এ পূজার ধ্যান ধারণা প্রত্যেক রমণীর নিকটই বড় সুলভ। বিশেষতঃ বিধবা রমণীর নিকট আর কোন পূজা-পদ্ধতি সুখকর বা শান্তিপ্রদ হইবে কি না জানি না। তাই বলিতেছিলাম, মৃত স্বামীর স্মৃতির, অতীত প্রণয়ের স্মৃতির ধ্যান ধারণাই বৈধব্যজীবনের একমাত্র শান্তির জিনিষ এবং সংসারারণ্যে পথ-প্রদর্শক ও চরমোন্নতির মূল সূত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিচ্ছেদানলের তাপ প্রাণে যত লাগিবে, ভবিষ্যৎ জীবনের পথ ততই পরিষ্কার হইবে। ইহা হঠাৎ নিতান্তই অর্থহীন বোধ হয়। স্বামীর অতীত প্রণয়ের মধুরতা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতেই তাহার অভাবজনিত ক্লেশে প্রাণ দগ্ধ হয়। জ্বালা যত বেশী হয়, ততই অতীত সুখের মূল ও পূর্ণত্ব কোথায় জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং পার্থিব প্রণয়ের অপূর্ণতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, সুতরাং পূর্ণ প্রেমাধারের সন্ধান পাইবার জন্যই মন সমুৎসুক হইয়া উঠে। এইরূপে ক্রমেই বিধবা-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথ ঠিক্ হইয়া, হৃদয়ের প্রেম-ভক্তি ভগবানে আরোপিত হইতে থাকে। ক্রমে বিধবা-জীবনের সংসারের সমস্ত আশা-বাসনা-আসক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া ভগবানে অর্পিত হয়। করুণাময় ভগবান্ স্বামী-পুত্র-পিতা-মাতাদিরূপ প্রত্যেক আধারে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার নানাবিধ মধুর স্বাদ আমাদিগকে উপভোগ করাইতেছেন। আমরা যখন তাঁহার লীলারহস্য বুঝিতে না পারিয়া স্থূল দেহকেই 'আমি আমার' ভাবিয়া মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, তখনই আমাদের চিরমঙ্গলময় শ্রীহরি আমাদের আবদ্ধ হইবার হেতু স্বামি-সন্তানরূপ স্থূল দেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। করুণাময় ভগবান্ কখনও আমাদিগকে কাঁদাইয়া সুখী হন না। আমাদের শুভাশুভ আমরা কি বুঝি? চিরমঙ্গলময় ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের শুভাশুভ বিচার করিয়া আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরা পতি-প্রেমের অভাবে পূর্ণপ্রেমাধার তাঁহাকে চিনিতে চেষ্টা করিব। সেই জন্যই আমা-দিগকে এই গুরু আঘাতে ব্যথিত করেন। এই প্রকার সংসারে দুঃখবিপদাদি সকলই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত হইলেও করুণাময় ভগবানের করুণানিঃসৃত কৌশল-ময় ইঙ্গিত বা সপ্রেম আহ্বান। এইরূপ অনেক শুনিতে পাওয়া যায় যে, শোক-দুঃখে নিষ্পেষিত হইয়া অনেক নরনারী

চরমোন্নতি লাভ করিয়াছেন। আমরা অভাগিনী বিধবা রমণীগণ যে করুণাময় ভগবানের কৃপাপাত্রী, ইহাতে সন্দেহ নাই। "যত অভাজন তাঁর মহাজন" এই মহাজন-বাক্য অতি সত্য কথা।

বিধবা-জীবনের প্রথম অবস্থায় স্বামীর চিন্তা ব্যতীত কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি অনেকের প্রিয়তম সন্তানের প্রতিও বিরক্তি উপস্থিত হয়। সুতরাং কোন কার্য্যেই উৎসাহ বা প্রীতি থাকে না। কিন্তু সকলই স্বামীর। আমিও স্বামীর, সন্তানাদি স্নেহের পাত্র, কি গুরুজন প্রভৃতি সকলই স্বামীর। সুতরাং সংসারে যাহা কিছু কার্য্য, সকলই স্বামীর, এই ভাব প্রাণে থাকিলে দেহপাত করিয়াও কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মিয়া থাকে। ক্রমে যখন স্বামী-দেবতা ভগবানের অপূর্ণাংশ ভাবিয়া পূর্ণপ্রেমাধারের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তাহাতেই জীবনের সমুদায় বাসনা, কামনা ও আসক্তি নিবদ্ধ হয়, তখন সন্তান প্রভৃতি পরিবারবর্গ হইতে যাবতীয় জীবজন্তু, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকলই সেই অনন্তের অস্তিত্ব, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সকলই ভগবানের কার্য্য জানিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, আবদ্ধ হইতে হয় না। কিন্তু সকলের মূলই পতিপ্রেম। সুতরাং বিধবা-জীবনে অতীত প্রণয়ের স্মৃতি অতি অমূল্য বস্তু এবং সাধনপথে সোপানস্বরূপ।

জনৈক হিন্দু বিধবা।

পুণ্য জীবনের প্রচ্ছন্ন কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।:)

সেই সময়কার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তিপ্রদ এবং 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই মূল মন্ত্র লইয়া সকলেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেন, এবং যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু বিলাসিতা এবং যাহাতে সংযমের ব্যতিক্রম ঘটে, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা যতই অপরিণতবয়স্ক হউন না কেন, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে আপনাকে রক্ষা করা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন তখন পুনরুত্থানকারীদিগের সমাজে পসার ছিল না, তাঁহারা কপটবেশী ও মহা ঘৃণিত হইতেন। আমার জীবনের যত সৌভাগ্য বিধাতার বলে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সাধুদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাকেই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। এই হীন জীবনে যাহা কিছু মহৎ ভাবের উন্মেষ কচিৎ কখন দেখা দিয়াছে, তাহা কেবলি ঐ সাধুসঙ্গের গুণে। আমার যখন হিন্দুপ্রথামতে, কয়েক ঘণ্টার কথায়, বসু মহাশয়ের সহিত পরিণয় স্থির হয়, তখন আমার বয়স ১১ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের পরেই তিন বৎসর ফরিদপুরে পিতার গৃহে পরম যত্নে ও আদরে অতিবাহিত হইয়াছিল।

ঐ সময়ে পিতামহী ও মাতামহীর কৃপায় আমি ধেড়ামেয়ে "Tomboy" বলিয়া, আখ্যা পাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, বিবাহ হইবামাত্রই বহির্বাটীতে বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও বন্ধ হইয়া যায়। এতকালে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু শিক্ষা লাভ ঘটিয়াছিল, ঠাকুরমা ও দিদিমার প্রসাদে একেবারে হজম হইয়া যায়। হাতের লেখাও এমন শ্রীশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে মহিষ ও মহিষশাবক একটা অনায়াসে গলিয়া যাইতে পারিত। পাঠকপাঠিকাগণ ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আমার বিবাহের সময় বসু মহাশয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসার। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ১৫০৲ স্কলারসিপ এবং গণিতে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়া যথেষ্ট পুরস্কার পান। তা ছাড়া জমীদারী হইতেও চার পাঁচ শত টাকা নিয়মিতরূপে মাসে মাসে আসিত। পিতামহাশয়ের কর্তৃক তাড়িত হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহার ঐ কৃতবিদ্য জামাতার নিকট চিঠি লিখিতে বসিতে হইত। ঐ ঘোরতর পরীক্ষার কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এমনি বিদ্যার দৌড় ছিল যে, কালী দিয়া লিখিতে জানিতাম না। পিতৃদেব বহুকষ্টে অমানুষিক ধৈর্য্য ধরিয়া একটা পেন্‌সিল কাটিয়া দিতেন, কিন্তু হায়! শ্রীশ্রীচরণকমলেষু লিখিতে দুই তিন তা কাগজ শেষ হইয়া যাইত।

কিন্তু বসুমহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তিনি যে অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক, পিতামহাশয় সকলের নিকট অকাতরে বলিতেন এবং সংবাদপত্রেও তাঁহার যথেষ্ট যশোগান পাঠ করিতাম; ইহার ফলে আমার ন্যায় বন্যপ্রকৃতি পল্লীগ্রামবাসিনী বালিকা নিজের হীনতা বুঝিয়া তাঁহাকে যমের মত ভয় করিতে শিখিল। ইহাতে যে আমার বেশী দোষ ছিল, তাহা বলা যায় না। কারণ, বসুমহাশয়ের গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবকাশে জয়সিদ্ধি যাইবার সময় শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে তিনি ফরিদপুরে কয়েক-দিন বাস করিতেন। ঐ সময়ের মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে তিনি বালিকাবিদ্যালয়গৃহে বক্তৃতা করিতেন। আমার পরমস্নেহাস্পদ ভ্রাতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পরিবারস্থিত আমার সমবয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েরা বসুমহা-শয়ের বক্তৃতা শুনিয়াই আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিত, ভাই আমরা আর বিবাহ করিব না। তোমার বর চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অবিবাহিতা থাকিব। এদিকে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মাব-লম্বী, প্রত্যহ আমাদের গৃহে উপাসনা। ব্রাহ্মগ্রন্থাদি পাঠের সময় মাতৃদেবীকে পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে হইত। ভোর ৪টা বাজিতে না বাজিতে পিতৃদেব আমার শিশু ভ্রাতা ও আমাকে উঠাইয়া প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করাইয়া আমার শিশু ভ্রাতা

জগদীশ ও আমাকে "যে দেবতা অগ্নিতে, যে দেবতা জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল মন্ত্র আবৃত্তি করাইতেন। তাহা ছাড়া ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতাম। স্নেহভাজন ভ্রাতা হেরম্বের পিতা চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের সরল প্রার্থনা আমাদের এত ভাল লাগিত যে, পৌত্তলিকতা এবং হিন্দুসমাজের প্রচলিত ব্যবহারের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ঐ বালিকা বয়সেই মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান জীবনে পরিণত করিতে হইবে, এই সঙ্কল্প আমার বালিকা-হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বসুমহাশয় অত্যন্ত কঠিন পুস্তকাদি লইয়া আমাকে ভাল করিয়া পাঠ করিবার কথা বলিয়াই দেশে প্রস্থান করিতেন। একদিন হঠাৎ বামাবোধিনীতে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর নাম দেখিয়া বসুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ইঁহার নামের অগ্রে কুমারী লেখা কেন? তখন তিনি বলিলেন, ইনি জ্ঞানে ধর্ম্মে এবং সুশীলতায় ভারতনারীর আদর্শ—আমি ইচ্ছা করি, তুমি ইঁহার মত হও। তখন আমার বক্ষ প্রকৃতি পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পাইল। আমি বইগুলি সজোরে দূরে ছড়াইয়া বলিলাম, তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া এত বড়াই কর, তবে আমার মত অল্পবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? আমি বসুমহাশয়ের সহিত অতি অল্প কথাই বলিতাম। তিনি হঠাৎ আমার মুখে এরূপ স্পষ্টোক্তি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাহার পর বাল্যবিবাহাদির কথা বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম উচ্চশিক্ষিত বন্ধুগণ আমার বালিকাজীবন উদ্বেগপূর্ণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, পরম শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রচার উদ্দেশে আমাদের ফরিদপুরের বাটীতে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। আচার্য্যদেবের জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাদির গুণে ফরিদপুর সহরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। সেই সময়ে আমাদের গৃহে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি চলিত। এখনও যেন সেই আচার্য্যদেবের সেই ধর্ম্মোৎসাহপ্রদীপ্ত দেববিনিন্দিত মুখচ্ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়।

আব্রাহাম্ যেরূপ সমাজে লালিত হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে সময় ইণ্ডিয়ানার মহিলাগণ দশ বার মাইল পথ পদব্রজে গমন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। বেশভূষার পারিপাট্যের দিকে তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। স্বামীর পুরাতন পরিত্যক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া তাঁহারা মন্দিরে উপাসনায় যোগদান করিতেন। বৃদ্ধেরা প্রায় সকল সময়ই আপনাদের সঙ্গে বন্দুক রাখিতেন। শিকারের জন্য অরণ্যে গমন করিবার সময় যেমন তাঁহারা সঙ্গে বন্দুক লইতেন, উপাসনা-মন্দিরে যাইবার সময়ও সেইরূপ তাঁহাদের সহিত বন্দুক থাকিত। শীতকালে এক এক বাড়ীতে এক এক দিন উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। যাঁহার গৃহে উপাসনা হইত, তাঁহারই ব্যয়ে সমাগত সভামণ্ডলী সুরাপান করিতেন। সে সময় কোনও সুস্বাদু ফল পাওয়া যাইত না বলিয়া সভাগণ সুরার সহিত সিদ্ধ আলু ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। সুরাপানান্তে তাঁহারা সকলে আপন আপন আসনে উপবেশন করিলে, উপাসক স্বীয় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া সঙ্গীতান্তে উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করিতেন। উপাসনা শেষ হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেশবাসিগণ বড়ই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল। যদি কোন অশ্ব কোনও বালকের শরীরের উপর নিঃশ্বাসপাত করিত, তাহা হইলে তাহারা মনে করিত যে, সেই বালকটীর শীঘ্রই সর্দ্দি ও কাসি হইবে। কোন পক্ষী কোনও লোকের জানালার মধ্য দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, তাহারা স্থির করিত, যে, উক্ত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইরূপ কুসংস্কারের শত শত প্রমাণ শুনিতে পাওয়া যায়। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে উক্তরূপ সমাজে আপনার জীবন গঠন করিতে হইয়াছিল।

আব্রাহাম্ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার পিতাকে আর অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিতেন না। প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি জনকের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইলেন। পরিশ্রমী পুত্রের সহায়তায় টমাস্ লিন্‌কন্ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। আব্রাহাম্ ক্ষেত্রে স্বয়ং কঠোর পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার সহিত যাহারা কার্য্য করিত, সরল

কথোপকথন দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিতেন।

কিয়দ্দিবস পরে জেমস্ টেলার নামক এক ব্যক্তি আব্রাহাম্ লিন্‌কন্‌কে মাসিক পঁচিশ শিলিং অর্থাৎ প্রায় উনিশ টাকা বেতনে তাঁহার অধীনে কার্য্য করিবার জন্ম আহ্বান করিলেন। আব্রাহামও হৃষ্টচিত্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ওহিও নদীর পার-ঘাটে নৌচালকের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এ কার্য্য ব্যতীত তাঁহাকে অনেক সময় লাঙ্গল চালন ও রন্ধন করিতে হইত। শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়া তিনি কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিন চারি জন শ্রমজীবীর কার্য্য তিনি অনায়াসে একাই সম্পন্ন করিতে পারিতেন। এই সময় আমেরিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে মদিরা-সেবন-প্রথার প্রাবল্য লক্ষিত হইত। অনেক যুবক সুরাপানে মত্ত হইয়া আপনাদিগের জীবন কলঙ্কময় করিত, কিন্তু আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ এ বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ রাখিতে পারিয়াছিলেন। সুরার আস্বাদন তিনি একেবারেই অবগত ছিলেন না। টেলারের অধীনে কার্য্যকালে তিনি কয়েক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন অন্যান্য যুবকগণ সুরাপানে বিভোর হইয়া থাকিত, আব্রাহাম্ তখন পুস্তক-পাঠে নিমগ্ন হইয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। প্রাপ্ত পুস্তক কয়খানির মধ্যে একখানি যুক্তরাজ্যের ইতিহাস ছিল। আব্রাহাম্ গভীর মনঃসংযোগে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। লিনকনের সহিত একই গৃহে এবং একই শয্যায় জেমস্ টেলারের একটী পুত্র শয়ন করিতেন। আব্রাহাম্ পুস্তক অধ্যয়নার্থ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহে আলোক প্রজ্বলিত রাখিতেন বলিয়া তিনি বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদিন রাত্রিতে আব্রাহাম্ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, রাত্রিও অনেক হইয়াছিল, এমন সময় টেলারের পুত্র তাঁহাকে পাঠ বন্ধ করিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আব্রাহাম্ অনুরোধ রক্ষা না করায় টেলারের পুত্র তাঁহাকে প্রহার করিলেন। প্রভুপুত্রের দুর্ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইলেও আব্রাহাম্ স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রোধ দমন করিয়া নীরবে পুস্তক অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন। ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুতা সর্ব্বত্রই বিজিত হইয়া থাকে। এ স্থানেও তাহাই ঘটিল। জেমস্ টেলারের পুত্র আব্রাহামের সাধু ব্যবহারে মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি আব্রাহামকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেন। নয় মাস কাল সুচারুরূপে কার্য্য করিবার পর আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ জেমস্ টেলারের কার্য্য হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আব্রাহাম্ লিনকনের একটী ভগী ছিল, তাহার নাম 'সারা'। তিনি এত দিন অবিবাহিতা ছিলেন। বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে, নির্দ্দিষ্ট দিনে এরন্ গ্রীগস্বী (Aron Grigsby) নামক এক ব্যক্তির সহিত সারার শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে আব্রাহাম্ "আডম এবং ইভের উদ্বাহসঙ্গীত" (Adam and Eve's Wedding Song) শীর্ষক একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটীর দুইটী শ্লোক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"The Lord was not willing
That man should be alone,
But caused a sleep upon him,
And took from him a bone.

* * * *

"The woman was not taken
From Adam's feet, we see;
So we must not abuse her,
The meaning seems to be."

বিবাহ সম্বন্ধে এই সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, বিবাহের এক বৎসর পরই সারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভগিনীর অকাল-মৃত্যুতে আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ প্রাণে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। সারার মৃতদেহ তাহার জননীর কবরপার্শ্বে সমাহিত হইয়াছিল।

কিছুকাল বাড়ীতে থাকিবার পর আব্রাহাম্ জেন্‌ট্রী ভাইল পল্লীনিবাসী মিষ্টার জোন্সনামক জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক তাঁহার ব্যবসাভাণ্ডারে কার্য্য করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। কার্য্যটী নূতন এবং পরিশ্রমসাধ্য হইলেও তিনি পুস্তক-অধ্যয়নের সুবিধায় বঞ্চিত হন নাই। মিষ্টার জোন্স আব্রাহামের জ্ঞান-পিপাসা দেখিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে পুস্তক-অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রভুর উৎসাহদানে আশ্বস্ত লিন্‌কন্ মহৎ লোকদিগের জীবনী ও নানা সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তিগণের জীবনচরিত আলোচনার সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রে লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাদিও নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি পাঠের সুবিধার জন্য মিষ্টার জোন্‌স একখানি সংবাদপত্রের গ্রাহক হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আব্রাহামের সহিত রাজনৈতিক বিষয়-সকলের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার ব্যবসা-ভাণ্ডারে প্রত্যহ বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির সমাগম হইত। আব্রাহাম্ নিজ গুণে তাঁহাদের নিকট পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন জোন্‌সের অধীনে কার্য্য করিতে পারেন নাই। প্রভুর সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জোন্‌সের সহিত

তাঁহার আত্মীয়তার বিচ্ছেদ হয় নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে জোন্সের কারখানায় বেড়াইতে যাইতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় আব্রাহাম্ লিন্কন্ তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত মিষ্টার জোন্সের কারখানা হইতে গৃহে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, রাস্তার পার্শ্বে একটী লোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনি লোকটীর নিকট গমন করিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। নিদারুণ শীতের প্রকোপে লোকটীর সর্ব্বশরীর বরফের ন্যায় শীতল হইয়া গিয়াছিল। আব্রাহামের বন্ধুগণ তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া সে স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু আব্রাহাম্ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, লোকটী মৃত নহে, অধিক পরিমাণে সুরাপানের ফলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; তোমরা সকলে ইহার জীবনরক্ষার সহায়তা কর। আব্রাহামের অনুরোধ রক্ষিত হইল না; তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা আব্রাহামের হৃদয় সহৃদয়তায় ও উদারতায় পূর্ণ ছিল; তিনি সেই মদ্যপায়ীকে পথিমধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সে অবস্থায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া লোকটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিদারুণ শীতে অতিশয় কষ্টের সহিত, ডেনিস্ হাঙ্কসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ডেনিস্ হাঙ্কস্ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন এবং আব্রাহাম্ সেই মৃতপ্রায় মদ্যপায়ীর শরীরে উত্তাপ দান করিতে লাগিলেন। ডেনিসের সাহায্যে এবং আব্রাহামের যত্নে ও পরিশ্রমে সেই মদ্যপায়ী ক্রমে আপনার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিল। তাঁহার যত্নে যে একজন লোক আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, ইহা ভাবিয়া আব্রাহাম্ লিন্কন্ অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

মিষ্টার জোন্সের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আব্রাহাম্ কিছুদিন নিয়মিতরূপে কাহারও অধীনে কোন কার্য্য না করিলেও, মধ্যে মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেন। কার্য্য হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা টমাস্ মনে করিতেন যে, তিনি বড়ই শ্রমকাতর হইয়া উঠিতেছেন। আব্রাহাম্ লিন্কন্ অধিকাংশ সময়ই উইলিয়ম উড্ (William Wood) নামক এক ব্যক্তির সহিত কর্ম্ম করিতেন। মিষ্টার উড্ দুইখানি সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। আব্রাহাম্ সেই সংবাদপত্র দুইখানি অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সদাশয় উইলিয়ম উড্ আব্রাহামের জ্ঞানপিপাসা দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই অধ্যয়নে উৎসাহ দান করিতেন। সংবাদপত্রাদি এবং পুস্তকপাঠের ফলে আব্রাহাম্ অতি অল্প বয়সেই একজন সুলেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "মিতাচার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উইলিয়ম উড্ বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধটী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় আব্রাহামের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার দুইটী শ্লোক আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম,—

Good boys, who to their books apply,
Will all be great men by and by.
"Abraham Linkon, his mind and pen;
He will be good, but God knows when."
"Time what an empty vapour 'tis
And how swift they are!
Swift as an Indian arrow,
Fly on like a shooting star.
The present moment just is here
Then slides away in haste,
That we can never say they're ours,
But only say they're past."

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ কবি বলিয়া পরিচিত বা সমাদৃত নহেন; সুতরাং তাঁহার সহিত কোনও কবির তুলনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলি যে, তাঁহার ন্যায় সাংসারিক কষ্টে কালাতিপাত করিয়া এবং দুই এক খানি সংবাদপত্র এবং কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে তিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয়।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ জলপথে ভ্রমণ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন, কিন্তু অর্থাভাবে জলপথ ভ্রমণের বড় সুবিধা হইত না। কোনও উপায়ে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে পারিলে জলপথে ভ্রমণের সুবিধা এবং সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনও হইবে এই ভাবিয়া, আব্রাহাম্ একখানি নৌকা নির্ম্মাণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি পিতার নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, টমাস আনন্দের সহিত তাহা অনুমোদন করিলেন।

আব্রাহামের যত্নে এবং শারীরিক পরিশ্রমে অতি শীঘ্রই নৌনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আব্রাহাম্ নৌকাখানি লইয়া প্রায় নদী বক্ষে বিচরণ করিতেন। একদিন তিনি নৌকা লইয়া নদীর মধ্যস্থানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় তীর হইতে দুইটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহাকে নৌকা লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আব্রাহাম্ তৎক্ষণাৎ নৌকা লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক

দুইটী একখানি ষ্টীমারে উঠিবেন। আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহারা নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ষ্টীমারের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। আব্রাহাম্ পারিশ্রমিক স্বরূপ একটী ডলার (অর্থাৎ প্রায় ৩ৎ টাকা) প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই ঘটনায় বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এক ডলার উপার্জ্জন তাঁহার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি যুক্তরাজ্যের সভাপতির (Prisident) পদে অভিষিক্ত হইবার পরে এই ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"Gentlemen, you may think it was a very trifling thing and in these days it seems to me a trifle; but it was a most important incident in my life. I could scarcely believe that I, a poor boy, had earned a dollar in less than a day. I was a most hopeful and confident being from that hour." অর্থাৎ ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা সকলেই এই ঘটনাটী অতি সামান্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। এক ডলার উপার্জ্জন এখন আমারও নিকট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু ইহাই আমার জীবনের একটী বিশেষ ঘটনা। দরিদ্রের সন্তান হইয়া আমি যে এক দিনের অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে এক ডলার উপার্জ্জন করিয়াছি, ইহা আমি স্বয়ং বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। ইহার পর হইতে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিত ও বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলাম।

১৮২৮ খৃঃ অঃ ১লা মার্চ তারিখে আব্রাহাম্ লিন্‌কন জেন্‌ট্রিভাইল পল্লী নিবাসী মিষ্টার জেনট্রি নামক জনৈক ভদ্রলোকের অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিষ্টার জেন্‌ট্রি আব্রাহামের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আপনার পুত্রকে তাঁহার সহিত নিউ অর্লিন্সে (New Orleans) পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অল্প-বয়স্ক হইলেও আব্রাহাম্ এই দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলেন না। মিষ্টার জেন্‌ট্রি আব্রাহামকে এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের এবং ব্যবসায়ের সমুদয় সামগ্রীর ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ও মিষ্টার জেন্‌ট্রির পুত্র এলেন (Allen) নিউ অর্লিন্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিকূল স্রোতে এবং বায়ুতে নৌকা চালান অতিশয় কষ্টকর হইল। নৌকার মধ্যে বাসযোগ্য প্রকোষ্ঠ ছিল না; শীতনিবারণের জন্য একখণ্ড কম্বল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন পথিমধ্যে দস্যুদল সুবিধা পাইলেই নৌকা লুণ্ঠন করিত;

সুতরাং নৌকারক্ষার্থ কাহাকেও না কাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত। এক দিন সন্ধ্যার পর আব্রাহাম্ নৌকা তীরের অনতিদূরে নঙ্গর করিলেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদল দস্যু দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে নৌকামধ্যে প্রবেশ করিল। অতুল সাহসের সঙ্গে আব্রাহামের শরীরে অসাধারণ বল ছিল; তিনি প্রভুর দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন। দস্যুগণ বিতাড়িত হইল। এই ঘটনায় আব্রাহাম্ আপনার শরীরে এমন এক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

অনাথনাথ বসু।

স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিপূজা।

হে তাপস! তমসায় পরিব্যাপ্ত ধরা,
তোমার বিহনে দেব! হয়ে আছি মরা।
আচম্বিতে লুকাইলে নারীর বান্ধব!
কোথায় লইল তোমা সে কাল ভৈরব।
স্নেহাশীষ নাহি দিলে, না লয়ে বিদায়,
বিজলীর মত চলে গেলে অমরায়।
দিগন্ত যে মেঘাচ্ছন্ন ভরা হাহাকার,
তাপস! দেখাবে কি গো ত্রিদিব-দুয়ার?
স্মৃতিপটে জাগে ওই প্রশান্ত মূরতি,
তোমার বিহনে দেব! হারায়ে শকতি,
অন্ধকারে ভ্রান্ত মন দিশাহারা—
অকূলেতে ধায়, জানিনা কোথায়
গেলে পরাণি জুড়ায়।
মহারাজ চরণেতে স্থান লভিয়াছ,
আমাদের ছেড়ে তুমি কেমনেতে আছ?

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

বিসূচিকা বা ওলাউঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিক্রিয়া অবস্থা (Reaction)— হিমাঙ্গ অবস্থা হইতে উত্তাপের অবস্থা হয়। এ অবস্থায় অস্থিরতা কমিয়া আসে, শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়, নাড়ী মণিবন্ধে পাওয়া যায়, ঘর্ম্ম হয়, নিদ্রা হয়, প্রস্রাব অল্প অল্প হয় এবং মলে পিত্ত থাকে। অনেক সময়ে ২৩ দিন প্রস্রাব হয় না, তাহাতে তত ভয়ের কারণ নাই। অল্প অল্প জ্বরের মত উত্তাপ হয়।

কখন কখন হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু না হইলেও চিহ্নগুলি বৃদ্ধি পায়; বিষম সান্নিপাতিক জ্বরের মত হয়; প্রলাপ হয়, অজ্ঞান অবস্থা হয়, কোমা হয়; মল তরল (জলের মত) হয়; পীতবর্ণ মল হয় ও

তাহাতে আঠাযুক্ত পদার্থ থাকে, শেষে পিত্ত থাকে; সবুজ রং হয়, মসুরী দানার মত রং হয়, পরে স্বাভাবিক রং হয়।

Re-action অবস্থায় অনেক সময়ে মলে রক্ত থাকে। কখন কখন মলে দুর্গন্ধ হয়। এই সময়ে প্রস্রাব হওয়ার প্রয়োজন হয়। রোগের আক্রমণ সামান্য হইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব হয়: গুরুতর স্থলে ২।৩। ৪। ৫। ৬ দিনের মধ্যে প্রস্রাব হয়। প্রথমতঃ প্রস্রাব পরিমাণে অল্প হয়, শেষে অধিক প্রস্রাব হয়। প্রথমকার প্রস্রাব ঘোলা হয়, অগুনালিক (Albumen) পদার্থ থাকে, অথবা মূত্রগ্রন্থির আবরণ (Tubules) থাকে, Epethelium থাকে. অল্প পরিমাণে Urea ও Uric acid থাকে, Cloride থাকে, Phosphate ও Sulphate থাকে।

প্রতিক্রিয়া অবস্থায়ও নানা কারণে মৃত্যু হইতে পারে; (১) শ্বাসকষ্ট হয়; (২) অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয়; (৩) Urimic coma হয়; ৪) পরে দুর্ব্বলতা হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

এ রোগ শিশু ও বৃদ্ধদের হইলে ভয়ের কারন থাকে। গুরুতর স্থলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে হিমাঙ্গ অবস্থা হইয়া মৃত্যু ঘটে, কখন কখন ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হইতে পারে।

মৃত্যু—(১) ভয় পাইয়া হইতে পারে, এ অবস্থায় বমি হয় না; (২) ভেদবমি হইয়া হইতে পারে; (৩) হিমাঙ্গ অবস্থা সারিয়া গিয়া জর হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বসন্তের পরে এ রোগ গুরুতর হয়, অনেকের মৃত্যু হয়; শরৎকালে তত হয় না কখন; কখন Epidemic-এ অধিক মৃত্যু হয়

সাধারণ চিকিৎসা—স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় নিয়ম পালন করিবে; পরিষ্কার জল খাইবে (যে জলে ময়লা কাপড় ধোয়া হয় না); আহারের বিষয়ে সতর্ক হইবে। উদরাময়ের অবস্থাতে চিকিৎসা করিবে ও সাবধানে থাকিবে।

ঔষধ—এ অবস্থায় কখনই Pulsatilla and Nux vom দিয়া চিকিৎসা করিবে না; তখন Arsenic, Veratrum alb দিয়া চিকিৎসা করিবে।

ডাক্তার সালজার এক সময়ে খিদিরপুরে ওলাউঠা রোগের প্রবলতায় Antim Tart দিয়া ফল পান; কারণ, সে সময়ে বসন্ত রোগের পর এ রোগ দেখা দিয়াছিল।

যখন চতুর্দ্দিকে ওলাউঠা হইবে ও অল্প অল্প উদরাময় হইবে, প্রথমে Veratrum alb দুই এক ফোঁটা জলে মিশাইয়া দিবে; পরে অবস্থানুসারে Cuprum, Arsenic, Camphor, Secale দিবে।

যদি নাড়ী পাওয়া না যায়, ভেদবমি বন্ধ হয়, Carbo veg কিম্বা Laurocerarus দিবে।

প্রতিক্রিয়া অবস্থায়—Aconite ৩০

দুই ঘণ্টা অন্তর দিবে। প্রলাপ অবস্থায়—Bell 6, Hyoscianus 6; Rhus Tox 6 দিবে। উদরাময়ের সঙ্গে বমনেচ্ছা ও বমি থাকিলে Ipecac 6, Veratrum 6 দিবে।

অনেক সময়ে Camphor অধিক পরিমাণে পড়াতে বুকজ্বালা হয়। সে অবস্থায় Phosphorus দিবে।

(ক্রমশঃ।)

উদ্ধৃত।

[বসুমতীর অতিরিক্ত পত্র (১৪ শ্রাবণ, ১৩১৭) হইতে]

ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণবিচার।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত আপ্টেনসিন্ ক্লেয়ার বহুদিন হইতে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে তিনি ভক্ষ্যদ্রব্য সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ প্রথমেই ভারতের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাত একটী পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্য। ভাতের ন্যায় একাধারে লঘুপাক ও পুষ্টিকারিতা গুণ অন্য কোনও পুকর খাদ্যে দেখা যায় না। ভাত এক ঘণ্টার মধ্যে পরিপাক হয়, কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য আড়াই ঘণ্টার কমে পরিপাক হয় না। চীন ও জাপানের অধিবাসীদের ভাতই প্রধান খাদ্য। আছাটা চাউলের ভাতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চীন ও জাপানের লোকেরা আছাটা চাউলের ভাতেরই অধিকতর পক্ষপাতী। আছাটা চাউলের আর একটী গুণ, ইহা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ রোগ এবং বেরিবেরি হয় না।

মাংস সম্বন্ধে ডাক্তার আপ্টেনসিন্ বলেন, মাংসাহারে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং নানাপ্রকার রোগের আবির্ভাব হয়। বিশেষতঃ রুগ্ন পশুদের মাংস আহার করিলে বধ্য জন্তুর দেহজাত রোগ ভোক্তাগণের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মাংসের পরিবর্ত্তে বরং বাদাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, বাদামে সে সমস্তই উপযুক্ত পরিমাণে নিহিত থাকে।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্ দধি ও ঘোলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, দধি অনেক রোগের ঔষধবিশেষ। পাক-স্থলী সংক্রান্ত রোগসমূহে দধি উৎকৃষ্ট

ঔষধের কার্য্য করে। ঘোল ও দধির স্থায় উপকারী। প্রতিদিন নিয়মিতরূপ ঘোল পান করিলে, শরীরের দুষ্ট বীজাণুসমূহ বিনষ্ট হয়। ঘোল ভোক্তাকে নীরোগ করে, ভোক্তার আয়ুবৃদ্ধি করে। ইয়োরোপের বুলগেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসিগণ পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। তাহার কারণ, তাহারা নিয়মিতরূপে প্রচুর পরিমাণে ঘোল পান করিয়া থাকে। ঘোলই তাহাদের একটী প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। বুলগেরিয়ান্‌দের আদর্শে ইয়োরোপে ঘোলের আদর যথেষ্ট বাড়িয়াছে। রুষিয়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যাকনিকফ্‌ ইতিপূর্ব্বে দধি ও ঘোলের উপকারিতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি অনেক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্কিণ ডাক্তার আপ্টেনসিন্‌ও ম্যাকনিকফের উক্তির সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্‌ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যপানের ইচ্ছার হ্রাস করিবার জন্য চিনি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। বলেন, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, মদ্যের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার করিলে মদ্যপানের ইচ্ছার হ্রাস হয়। মার্কিন্‌ যুক্তরাজ্যের সৈন্যগণের মধ্যে এক সময় মদ্যপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারকল্পে অবহিত হন গবর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত মিশ্রী ক্রয় করিয়া সৈন্যদিগকে প্রদান করেন। সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে মিশ্রী ভক্ষণে আদিষ্ট হয়। তাহার ফলে প্রকাশ পায়, উল্লিখিত উপায়ে সৈন্যগণের মদ্যপানের উদ্দাম প্রবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার বলেন, অত্যধিক পরিশ্রমের পর চিনির সরবৎ পান করিলে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়। জর্ম্মনরাজ্যের সৈন্যগণ দীর্ঘপথ অভিযানকালে ভক্ষণের জন্য চিনি পাইয়া থাকে।

ডাক্তার আপ্টেনসিন্‌ আলুর প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছেন, ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্য হইতে আলু একেবারে পরিত্যাজ্য। আলুতে শতকরা ৯৫ ভাগ জলীয় পদার্থ থাকে। আর শ্বেতসারী ভাগ যাহা কিছু থাকে, তাহাও সহজে পরিপাক হইতে চাহে না। আলুর পুষ্টিকারিতা শক্তি নিতান্ত অল্প। অধিকপরিমাণে আলু আহার করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও আলস্য জন্মে। যাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে প্রায়ই আলু আহার করেন, কিছুদিনের জন্য যদি তাঁহারা আলু পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের উদ্যম ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে।

বিরাট কচ্ছপ।

সম্প্রতি বিলাতের পশুশালায় (Zoological Garden) দুইটী বিরাট কচ্ছপ নীত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, এইরূপ প্রকাণ্ড কচ্ছপ ইতিপূর্ব্বে কখনও

দৃষ্ট হয় নাই। এই কচ্ছপ দুইটার বয়স অনুমান করা অত্যন্ত দুরূহ। পূর্ব্বে একবার 'মেথুসালেহ' নামক একটা কচ্ছপ বিলাতের পশুশালায় নীত হইয়াছিল। অনেকে 'মেথুসালেহ'কে ২৫০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার সহিত তুলনায় এই বর্ত্তমান কচ্ছপ দুইটার বয়স ৩০০ শত বৎসরের কম মনে হয় না। প্রসিদ্ধ কবি সেক্ষপীয়র এবং ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের প্রিয় পার্শ্বচর স্যার ওয়াল্টর র‍্যালের প্রাদুর্ভাবকালে এই বিরাট কচ্ছপ দুইটী ভারতমহাসাগরের 'আল্‌দাবরা' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে। এই 'আল্‌দাবরা দ্বীপ হইতে কচ্ছপ দুইটী ধৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রের কঠিন আবরণ দুইটী বেশ সুগঠিত। 'মেথুসালেহে'র আবরণ অনেকাংশে ক্ষয় হওয়াতে মসৃণ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, বর্ত্তমান কচ্ছপ দুইটার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। পতিতের উদ্ধার—ভারতের প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের জমিজমা বা ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই নাই। ইহারা বংশানুক্রমে তস্কর ও শঠের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মুক্তি-ফৌজের অধ্যক্ষ বুথ লর্ড মর্লির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এই সকল লোকের অবস্থানের জন্য একটী স্থান স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে এই ত্রিশ লক্ষ লোকের মুক্তিলাভ হয়।

২। পুষ্পকরথে ভ্রমণ—মিঃ ময়জাণ্ট পুষ্পকরথে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস হইতে লণ্ডন সহরে গিয়াছেন। তিনি পথে আমিন্সে ও ক্যালে নগরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

৩। শুনা যাইতেছে, এইবার এলাহাবাদে কংগ্রেস হইবে।

৪। শ্রীমতী আনিবেসান্তের বিশেষ চেষ্টায় ও যত্নে লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত ৩৯ নং ফেলোজ রোড্ হেমষ্টেডে একটী বাসা সংস্থাপন করা হইয়াছে। এখানে নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইবে, এবং ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প লাগিবে।

৫। পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য, সার আর্ণেষ্ট কেসেল ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইংলণ্ডপ্রবাসী দরিদ্র জর্ম্মাণ ও জর্ম্মণীপ্রবাসী দরিদ্র ইংরাজদিগের ভরণ পোষণের জন্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাট্ উইলিয়মের অনুমত্যানুসারে এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

৬। লর্ড মিণ্টো কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এই উপলক্ষে পঞ্জাবের

মুসলমান সম্প্রদায় ১১ই সেপ্টেম্বর ও তথাকার হিন্দু সম্প্রদায় ১৮ই সেপ্টেম্বর লর্ড মিণ্টোর সম্বর্দ্ধনা করিবেন স্থির করিয়াছেন। আগামী ১৫ই নবেম্বর টাউনহলে সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ হইতে একটী পার্টি দেওয়া হইবে।

৭। ওয়াচনন নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ রণতরী নির্ম্মাণ করিতে তিন কোটি টাকার অধিক খরচ হইয়াছে। ইহতে ১০টা বড় কামান ও ২০টা টর্পেডো থাকিবে। এই তরী ভাসান উপলক্ষে ৪০০০০ (চল্লিশ সহস্র) দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

৮। সিমলার সন্নিহিত ধর্ম্মপুরে মিঃ বি, এস মালাবারির প্রতিষ্ঠিত যে যক্ষ্মারোগীর আশ্রম আছে, তাহা অতঃপর সম্রাট্ এডোয়ার্ডের নামে অভিহিত হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভুলের সংসার।

ভুলের সংসারে, আসিয়ে কেবল,
পদে পদে ভুল দেখি হে।
তবু সেই ভুলে, দিবস রজনী,
আপনা ভুলিয়ে থাকি হে॥
স্নেহ, মায়া, দয়া, সকলি যে ভুল,
বুঝেও তবু না বুঝি হে,
সত্য যদি কিছু থাকে এ জগতে,
ভুলেও তারে না খুঁজি হে॥
আপন আপন, করিয়ে সতত,
ব্যস্ত হ'য়ে ঘু'রে মরি হে।
সময়েতে দেখি, সকলি পালায়,
কে রাখিবে তায় ধরি' হে॥
শেষে ঝরে অশ্রু, যুগল নয়নে,
হৃদি ফেটে যায় দুঃখে হে।
তবু ভুলে থাকি, জানিয়ে শুনিয়ে,
আপাত-মধুর সুখে হে॥
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কে আছে আপন?
করুণা-নয়নে চাও হে।
কাতরে ডাকিছে, দুর্ব্বলা রমণী,
ভুল ভেঙ্গে তার দাও হে॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ,
বাঙ্গইপাড়া, খুল্না।

কে তুমি?

কে তুমি আমারে তাহা কবে কোন জন?
দাঁড়ায়ে স্মৃতির দ্বারে আজ কত দিন পরে
আঁধার কুহেলী মাঝে প্রভাত স্বপন।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে, আছি তব আশা ক'রে,
আজ কি ভাঙ্গিল ধ্যান টলিল আসন,
আজ কি কুটীরদ্বারে রাখিলে চরণ?

সুনীল গগন-গায় দেখেছি তোমার কায়,
দেখেছি সে রামধনু চিত্রিত স্বপন।
দেখেছি শশীর হাসি, তারকার শোভারাশি.
দেখেছি সাগর-বুকে তপন-কিরণ॥
সন্ধ্যায় বিমান-পথে কে যেন পুষ্পক রথে
আনে ধরণীর তরে রত্ন আভরণ।
পাপিয়া সে কণ্ঠস্বরে, এ পরাণ মুগ্ধ করে,
ভাসায় সুধার তানে পৃথিবী গগন,
পুলকে শিহরি উঠে উতলা পরাণ॥
হে আমার স্মৃতিসখা! আজ তবে দিলে দেখা
আজি তপস্যার ফল বিধাতার দান।
নীরব কুটীর-দ্বারে, আজ এত কাল পরে,
আসিলে কি হে দেবতা! হে মম স্বপন!
হে সুন্দর হে বরেণ্য! নিখিল পাবন!
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা, গাঁথি চারু ফুলমালা,
তোমা-তরে উপহার করিয়া যতন,
পূত গঙ্গাজল দিয়া, রাখিতাম ভিজাইয়া,
তোমারই তরে নাথ! করহে গ্রহণ!
ধূপ-গন্ধ-আমোদিত অগুরু-চন্দন-সিত
রাখিয়াছি তোমাতরে পাতিয়া আসন।
এই শ্যাম বটতলে যেন তব পদমূলে
থাকিতাম যোগময়া যোগিনী যেমন॥
বিশ্বপ্রেম ধর্ম্মনীতি পতিত পাবন-গীতি
আমারে শিখাও তব আদর্শ মহান্।
তোমারে লইয়া নাথ! হইয়া তোমার সাথ
ভ্রমিব সে স্থানারণ্য বন্ধুর গহন।
বিজন কাননভূমি এর মাঝে তুমি আমি
যাপিব কতই যুগ যুগান্ত মতন॥
উপরে সে নীলাকাশ, নীচে ধরা পরকাশ,
মাঝে দুই প্রাণী যেন নর-নারায়ণ,
কি মধুর সেই ছবি, এক নভে দুই রবি,
শশী তারকার যেন অপূর্ব্ব মিলন॥
হে আরাধ্য, হে দেবতা, ওগো দয়াময়!
বিশ্বের উপেক্ষা কালী,মুছাইও প্রীতি ঢালি,
জুড়াইও তপ্ত হিয়া তব করুণায়,
তোমার সেবক আমি,তোমারে লইয়া স্বামি!
ভ্রমিয়া বেড়াব সুখে পুণ্যতীর্থচয়॥
নীতি নব অনুরাগে, ক্ষুদ্র হৃদি প্রেমযোগে
ফুটিবে এ অন্ধচক্ষু কিরণে তোমার,
তোমার পরশ পুণ্য, আমি যে হইব ধন্য,
তাহাতে বাইবে ভাসি দীনতা আমার।
সূর্য্যমুখী নবপ্রাণে ঊর্দ্ধমুখে ফুল্লমনে
ঢালি দেয়, মুগ্ধ হিয়া পদে তরণীর॥ (১)
দিবাকর কর-জালে তোষে তারে নানাছলে
একে রহে নীল নভে অন্যে পৃথিবীর।
তেমনি হে বিশ্বপ্রাণ! এই মম ক্ষুদ্র প্রাণ
জাগিয়া উঠুক প্রভো! জ্যোতিতে তোমার,
আমিও তেমনি করে, পূজিব প্রেমের ভরে,
আকাশ-পৃথিবী-মাঝে ধ্যান-নিমগন।
জাগিয়া উঠুক নাথ! সুষুপ্ত পরাণ,
এস এস প্রাণাধার! দেখ হিয়া জীর্ণ সার
সহিয়াছে কত বজ্র আঘাত ভীষণ!
যাক্ সে অতীত মুছে, মর্ম্মব্যথা যাক্ ঘুচে,
বাসনা কামনা আজ দিনু বলিদান,
হে সুন্দর! হে দেবতা! হে চির মহান্!

শ্রীমতী প্রমিলাসুন্দরী দেবী,
১৯৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(১) তরণী—সূর্য্য।

২৯৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 565. September, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৬৫ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩১৭। সেপ্টেম্বর, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্ট-চত্বারিংশ জন্মোৎসব।

যেরূপ একখানি তরী কত শত নর-নারী, কত জীবজন্তু এবং কত শত দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া অসংখ্য অসংখ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার বিভীষিকাময় তরঙ্গমালাসমাকীর্ণ, অতলস্পর্শী জলধির উপর দিয়া গমন করে, সেইরূপ বামা-বোধিনী সপ্তচত্বারিংশৎ বর্ষ ব্যাপিয়া কত শত জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি নিজ বক্ষে বহন করিয়া, অসংখ্য ভীতি-প্রদ বাধাবিঘ্ননিচয়ের মধ্যে এই অনন্ত কালসাগরের এক প্রান্ত দিয়া গমন করিতেছে। কত সময় উহার উর্ম্মিমালা এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, ইহাকে উহার গভীরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া ইহার অস্তিত্ব লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার যেরূপ নাবিক না থাকিলে পোতের গমন বন্ধ হয় এবং তাহা ঐ অগাধ সলিলরাশির উপর হাবুডুবু খাইতে থাকে, সেইরূপ কত সময়, কত অবস্থায়, ইহা চালকের অভাবে সেই অসীম কালার্ণবের উপর দোলায়মান হইয়াছে। যেরূপ জলযান অর্থাভাবে অঙ্গারাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া গতিশক্তি-হীন হইয়া যায়, সেইরূপ কত সময় অর্থাভাবে ইহারও গতিরোধ হইয়াছে। এইরূপ কত উন্নত এবং পতিত অবস্থার মধ্য দিয়া, কত সুখ এবং দুঃখের মধ্য দিয়া, ইহা এই ৪৭ বর্ষ পূর্ণ করিয়া ৪৮ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী বিধাতাই জানেন।

তিনি যে এত অবস্থান্তরের মধ্য দিয়াও ইহার অস্তিত্ব এখনও পর্য্যন্ত জন-সাধারণের নিকট দর্শন করাইতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিব জানি না, পরমেশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করুন।

তাঁহারই করুণায় ও তাঁহারই আদেশে